স্বামী স্ত্রী

স্বামী স্ত্রী

দেবেশ রায়

প্রতিভাস। কলিকাতা-৭০০০০২

প্রথম প্রকাশ :
এপ্রিল ১৯৬১

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রতিভাসের পক্ষে সন্ধ্যা সাহা কর্তৃক ১৮/৪, গোবিন্দ মণ্ডল রোড
কলকাতা-৭০০০০২ থেকে প্রকাশিত এবং ইডেন প্রিন্টিং
এর পক্ষে নিতাই সামন্ত কর্তৃক ২৬সি, সাহিত্য
পরিষদ ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬
থেকে মুদ্রিত।

উপন্যাস

যযাতি

আপাতত শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে

মানুষ খুন করে কেন

মফস্বলি বৃত্তান্ত

বেঁচে বর্তে থাকা

গল্প

দেবেশ রায়ের গল্প

দুই দশক

প্রবন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আদিগদ্য

সময় ও সমকাল

সম্পাদনা

ধানের গায়ে রক্তের দাগ

বিদ্যাসাগর : সমাজ ও সাহিত্য

দীপেন্দ্রনাথ রচনা সংগ্রহ

জীবনানন্দ সমগ্র

স্বামী স্ত্রী

শৌরীন্দ্রকে একটু আচমকা অফিস থেকে ফিরতে হয়। খবরটা হৈমকে দিতে হবে, পাড়ার অবস্থাটাও একবার বুঝতে হবে। দরজার ল্যাচের একটা অতিরিক্ত চাবি ওর কাছেই থাকে। কাউকে না ডেকেই ও শোয়ার ঘর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। দেখে, হৈম আর ঘোঁতন পাশাপাশি, মুখোমুখি শোয়া। অফিসের শার্ট-প্যান্টেই শৌরীন্দ্র দড়াম করে খাটে শুয়ে পড়ে আর পেছন থেকে হৈমকে জড়িয়ে ধরে। এমন হামেশাই হত বছর সাত আগে ঘোঁতন ছাড়াই, বা বছর চার-পাঁচ আগে ঘোঁতনসহই। শৌরীন্দ্র পাশে শুলে গভীর ঘুমের ভেতর থেকে ঢেউয়ের মতন উথলে হৈম শৌরীন্দ্রের দিকে ফেরে। হাঁটু-মাথামোড়া দলাপাকানো তার শোয়া। হাঁটু আর মাথা দিয়ে গুঁতিয়ে শৌরীন্দ্রের বুকের ভেতরই সেঁদিয়ে যেতে চায় যেন।

বছর সাত আগে এক সঙ্গে শোয়া শুরু হলে, হৈমর এই শোয়া প্রায় সমস্যা হয়ে উঠেছিল। হৈম শোয়া বদলাতে পারে নি। কিন্তু ঘোঁতন হওয়ার পর ওর মাথা আর হাঁটুর মাঝখানের ফাঁকটুকু জুড়ে ঘোঁতন এঁটে যায়। বাবার কাছে শুয়ে-শুয়ে এমনই শোয়া রপ্ত করেছিল হৈম যে ধাড়ি শরীরে সেই শোয়া হয়ে উঠেছিল আর-একটি ধাড়ি শরীরের সঙ্গে ঠোকাঠুকির কারণ। একটা শিশু এসে যেতেই তার সঙ্গে-সঙ্গে হৈমও নিজের শৈশবে ফিরে যেতে পারে।

শৌরীন্দ্র হৈমকে হাতের বেড়ে কাছে টানে। হাঁটু আর মাথার দুই কোণার দূরত্বে গোলপাকানো হৈমর শরীরটাকে সোজা করে নিতে চায় শৌরীন্দ্র, নইলে হৈমর কাছে যাওয়া যায় না। শৌরীন্দ্রকে শরীরের চাপ দিতে হয়। চাপ দিতে গিয়ে শৌরীন্দ্র যখন সব চেয়ে বেকায়দায় তখনই সে খাট থেকে ছিটকে দেয়ালে প্রায় ওয়াড্রোবের কাছে গিয়ে আছড়ে পড়ে। হৈম ক্যারাটে ঝেড়েছে।

বিয়ের পর-পর এমন হামেশাই ঝাড়ত। বাষট্টিতে শান্তিনিকেতনে জাপানি বিশেষজ্ঞদের কাছে মেয়েদের ক্যারাটে শেখানো হয়েছিল – যদি চীন এসে দেশ দখল করে নেয় তা হলে প্রতিরোধ করতে হবে না? যে-মেয়েরা ক্যারাটে শিখেছিল,

তারা সবাই কি এই প্রায় আট বছর পরও অভ্যেস বজায় রাখতে পেরেছে? হৈমর মত তাদের সবারই হাতের নাগালে কি অভ্যেস বজায় রাখার এমন পাত্র সুলভ আছে? কিন্তু আজ, অনেক, অনেক দিন পর হৈম এমন করল—।

শৌরীন্দ্রের ডান হাঁটুটায় ঠোকর লেগেছিল। কাত হয়ে পড়ে সে হাঁটুতে হাত বোলায় আর গোকার মত আপনমনে হাসে। কিন্তু ব্যথাতে সম্পূর্ণ হাসতেও পারে না—ঠোঁটের দুই কোণ কুঁচকে থাকে।

হৈম চোখ বুঁজে পড়ে আছে, যেন গভীর ঘুমে। তার চোখের মণি একটু-একটু নড়ছে। আগে, হৈমকে ঘুমেও যখন শৌরীন্দ্র দেখত, হৈমর বোঁজা চোখের ওপর দিয়ে মণি নড়ছে টের পেলেই শৌরীন্দ্র ঘুম থেকে ডেকে তুলত। হৈম বিহ্বল চোখ খুলত—তোমার চোখের পাতা এত বড় বড়, চোখ খোলা যেন ঝাঁপ খোলা—আর শৌরীন্দ্র বলত, কী স্বপ্ন দেখছিলে, বলো। হৈমর স্বপ্নও কী করে শৌরীন্দ্র টের পায়, সেই বিস্ময় হৈমর আর কাটতেই চাইত না।

এখন হৈমর মণি নড়ছে। কিন্তু ও ঘুমুচ্ছে না, মটকা মেরে পড়ে আছে। হৈম যখন শুরুই করেছে, তখন তাদের পুরনো খেলাটা হোক, দেশ-দেশ খেলা।

হৈমর মুদিত চোখের দিকে তাকিয়ে শৌরীন্দ্র শুরু করল, 'আকাশ বাণী, খবরের পড়ছি সুজন বোস। আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হল, চীনা সৈন্যদের সঙ্গে প্রয়োজনে প্রতিটি অলিতে গলিতে যুদ্ধের প্রস্তুতিতে শ্রীমতী হৈমন্তী চ্যাটার্জি নামে এক মহিলা এতই নিপুণতা অর্জন করেছেন যে তিনি তাঁর একমাত্র স্বামীকে ক্যারাটের একটিমাত্র আঘাতেই হত্যা করতে পেরেছেন ও স্বেচ্ছায় বৈধব্যবরণ করেছেন। রাষ্ট্রপতি এই বীররমণীকে তাঁর স্বামী হত্যা ও সদ্য-বৈধব্যের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন ও পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দিয়েছেন। কারণ, জয় আমাদের সুনিশ্চিত।'

হৈম চোখ খুলে তাকায়। তার ঘুম-ভরা ঠোঁটে একটা হাসি খুব ধীরে-ধীরে ফুটে ওঠে, হাসিটা যেন লেগে থাকবে ঠোঁটে—তোমার এই হাসি কেমন মূর্তির হাসির মত—হৈম শৌরীন্দ্রের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু দু জনের চাউনি যতক্ষণ মিললে দু জনের কথা জানাজানি হয়ে যায়, তার আগেই হৈম তার দৃষ্টি টলিয়ে দেয়।

শৌরীন্দ্র ভয় পায়, খেলাটা কি কেঁচে গেল। সে লাফিয়ে বিছানায় ওঠে, হৈমর দু দিকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে, দুই হাত ধরে. হৈমকে টেনে তুলতে শুরু করে। শৌরীন্দ্রের টানে হৈমর কাঁধ দুটোও ওপরে উঠে আসে, মাথাটা ঝুলে থাকে, 'এই, আমি শুয়ে-শুয়েই, প্লিজ, প্লিজ, আমি শুয়ে-শুয়েই'। হৈমকে ছেড়ে দিয়ে শৌরীন্দ্র লাফিয়ে মেঝেতে নামল, তার পর অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে যেন হুকুম ঝাড়ে, 'রেডি, ওয়ান, টু, উঠ গো ভারতলক্ষ্মী···' আঙুল নাড়িয়ে শৌরীন্দ্র হৈমকে গাইতে বলে। কিন্তু হৈম কাত হয়ে গালের নীচে হাত দিয়ে শুয়ে থাকে আর শৌরীন্দ্রের দিকে চেয়ে থাকে, যেন এখুনি আবার ঘুমিয়ে পড়বে।

শৌরীন্দ্র একটু হাসে · গাইতে-গাইতে যতটা হাসা যায়। শৌরীন্দ্র গানের একটা চূড়াতে উঠছিল খুব শিথিলতায়— আনাড়ির পক্ষেই যে শিথিলতা সম্ভব, 'কমলকনক ধনধান্যে', বোঝাই যাচ্ছিল গানটি এবার থেমে যাবে।

আর ঠিক তখন, খাদ থেকে হৈম দ্রুততায় গেয়ে ওঠে, 'জননী গো, লহ তুলে বক্ষে...।'

হাঁ করেও শৌরীন্দ্র আর সুরটা ধরে না, কারণ ততক্ষণে পুরুষ-গলার তার সপ্তকের মধ্যমের পর মেয়ে-গলার মধ্য-সপ্তকের ধৈবতে একটু সুরের নাটক তৈরি হয়ে যাচ্ছিল। হৈম শুয়ে থেকেই আঙুল দিয়ে শৌরীন্দ্রকে ইশারা করে ধরতে কিন্তু শৌরীন্দ্র তাকিয়েই থাকে। ফলে, হৈম গাইতে-গাইতে চোখ বুজে ফেলে। তার পর সুরের টানে চিত হয়। পাছে, সুরটা ছিঁড়ে যায়, এই ভয়ে, উঠে বসতে পারে না কিন্তু চিত শুয়ে সুরটাকে যেন আর রাখাও যায় না। খাদে, খুব সতর্কতায় 'ত্রিংশতি কোটি'-র সুরটুকু ধরে রেখে, হৈমকে শ্বাস ফেলার সুযোগটুকুমাত্র দিয়ে, শৌরীন্দ্র আরও খাদে, প্রায় নীরবতায়, নেমে যায়। হৈম উঠে বসতে পারে বটে, কিন্তু পা দুটো মোড়াই, সোজা করার সময় পায় নি। বাঁ হাতে ঠেকনো দিয়ে সুরটাকে সোজা রাখে। কিন্তু নিখাদ ধৈবতের সেই সরল-রেখার সুর তাতেও একটু নুয়ে যেতে পারে, হৈম তাই কোমরের বাঁক সত্ত্বেও তার কোমরের ওপরটাকে সরলতর করে তুলে, দুটি হাত কোলের ওপর রাখে। তার এলো খোঁপা সম্পূর্ণ ভেঙে গিয়েও বাঁ কাঁধের ওপর স্তূপ হয়ে আছে। তাকে একটু ডাইনে মুখ ফেরাতে হয়। ডান কাঁধ থেকে আঁচলে তার বাহু অনেকখানি

ঢেকে ছিল। গলাটাকে সরল রাখার আবেগেই বোধ হয় ভুরুর মাঝখানটা তিরতির করে কাঁপে, কুঁচকোলে যেন সুবিধে। বিস্রস্ত কোলে, একটি হাতের ওপর আরেকটি হাতে অঞ্জলির শূন্যতা পূর্ণ করে, হৈম, যেন সকালে শান্তিনিকেতন মন্দিরে গাইছিল—নিখাদ ধৈবত থেকে অন্তরঙ্গ খাদের পঞ্চম-মধ্যমে। হৈম, 'ভারতবর্ষ', ধ্বনিটি উচ্চারণ করে দেয়।

শৌরীন্দ্র তাকিয়ে দেখে, হৈমর ঠোঁট দুটোর অবিশ্বাস্য কমলা রঙের পুষ্টতা গোল হয়ে যায়, স্পষ্ট হয়ে ওঠে নীচের ঠোঁটের সূক্ষ্ম সরল ছোট-ছোট কুঞ্চন— বালিতে স্রোতের রেখার মতন, সেই কুঞ্চন মুছে যেতে-যেতে তার প্রায়-বন্ধ দু সারি দাঁতের ফাঁকে কমলা জিভের ডগাটুকুর ঝিলিকে 'ভারত' নির্মিত হয়ে যায়। আবার বন্ধ ঠোঁট খোলার আবেগ স্তম্ভিত হয়ে ওঠে রেফের পৌরুষে। হৈমর জিভের ডগার উল্টো দিকে অসমতল সিক্ততায় শৌরীন্দ্র 'ভারতবর্ষ' শব্দটি সম্পূর্ণ হতে শোনে আর হৈমর ঠোঁট-জিভ-মুখবিবরে, মুখের গরম নিশ্বাসে, সেই শব্দটিকে মূর্তি নিতে দেখে। সেই মূর্তির সঙ্গে অর্থের কোনো অন্বয় ছিল না।

পাছে হৈম থেমে যায়, শৌরীন্দ্র ধরে বসে, 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।' হৈমর 'জ-ন্ম-ভূ-মি' জুড়ে তার কাঁধে থমকানো এলো খোঁপা কোলের ওপরে ঝরে পড়ে। আর, সুরের কী কৌতুক! সুরটুকুকে ঠিক রাখার চেষ্টাতে, গলার চড়ায় খাদে, সুরের অসমতল প্রবাহে, যেন সত্যি জন্মভূমির জন্য এক গৌরব তরঙ্গিত বয়ে যায় রক্তে। হৈম চোখ বুজে, একটু বা দুলে, গায়, গেয়ে যায়।

বাষটিতে, তার বিশ বছর বয়সে, 'দেশ' কথাটির আচমকা-আবিষ্কারের রণন, বিয়ের পর-পরই পয়ষট্টির, আর, এই এখনকার একাত্তরে বাংলাদেশ নিয়ে যুদ্ধে-যুদ্ধে জীর্ণ হয়ে, অবশিষ্ট থেকে গেছে এক ত গানেরই সুরে।

চোখ খুলে হৈম দেখে শৌরীন্দ্র বিছানায় চিতপাত, এক হাত বাড়িয়ে তার দিকে। ডাক্তাররা যেমন রোগীর হাত ধরে, হৈম তেমনি শৌরীন্দ্রের কনুইটা বাঁ হাত ধরে ডান হাতে কনুইয়ের ভাঁজে সুচ ঢোকায়। বলল, 'এবার গাও—আমায় যে সব দিতে হবে।' শৌরীন্দ্র গান না-গেয়ে গলায় ঐ সুরে বাজনা বাজায়।

তার পর ঘোষণা করে, 'আকাশবাণীর—খবর। পড়ছি, অনিমা সানন্যাল্।

আজকের বিশেষ-বিশেষ খবর হল এই। যে। শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে শান্তিনিকেতন আশ্রমের তরুণ-তরুণীরা রক্তসহযোগে নৃত্য দান করেন। ক্ষমা করবেন, নৃত্যসহযোগে রক্ত দান করেন। তাঁরা প্রথমে। গান ও নাচের সঙ্গে আশ্রম প্রদক্ষিণ করেন ও। মেলার মাঠে লাইন বেঁধে শুয়ে পড়েন। তাঁদের শরীর থেকে যখন রক্ত। নেয়া হচ্ছিলোও, তখন। তাঁদের গলার 'আমায় যে সব দিতে হবে, সে ত আমি জানি'। এই গানে এক ভাবঘন পরিবেশ। সৃষ্টি হয়। পরে, চীনা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য মন্দিরে উপাসনা হ-অ-য়।'

ঘোঁতনের কান্নায় ওরা তাকিয়ে দেখে সে উল্টো দিকে মুখ করে কাত হয়েছে।

'কী রে ঘোঁতনা, কী হল?'

বাপের কথা শুনে ঘোঁতনের কান্না আরও বেড়ে গেল।

হৈম ঘোঁতনের পা টেনে বলে, 'দেখ, বাবাকে ইনজেকশন দিচ্ছি,' হৈম হাত বাড়িয়ে পরখ করে ঘোঁতন বিছানা ভিজিয়েছে কিনা। না।

'ঘোঁতন লক্ষ্মীসোনা, সি করে এসো, ওঠো।'

দু পা ছুঁড়ে ঘোঁতন চিৎকার করে, 'না-আ। যাব না।'

'কেন রে, কী হল।' শৌরীন্দ্র হাত বাড়িয়ে ঘোঁতনকে ছুঁতে চেষ্টা করে।

'চল্-চল্-চল্ করো না কেন', কান্না থামিয়ে ঘোঁতন চিৎকারে বলে।

'ও, এই ব্যাপার? চল্-চল্-চল্, ঊর্ধ্ব গগনে—' হৈম ঘোঁতনের পায়ের ওপরেই তাল ঠোকে। ঘোঁতন পা ছুঁড়ে হাত ত সরিয়ে দিলই, আরও জোরে চিৎকার করে ওঠে।

'কী হল রে আবার, গাইছি ত।'

'বসে বসে গাইছ কেন? লেফ্-রাইট করে গাও'. ঘোঁতন ঘাড়টা ঘোরায়, তার দু চোখের জল তখন গালে।

'ও বাবা, এ ত রীতিমতো যুদ্ধ বেধে গেল। এই, ওঠো ওঠো, তোমার প্যান্ট পরা আছে, লেফ্ট্-রাইট করো।'

শৌরীন্দ্র লাফিয়ে বিছানা থেকে নামল, লেফ্ট্-রাইট করে গাইতে লাগল, 'অরুণ প্রাতের....'

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে ঘোঁতন এক গাল হাসে, তার দু-চোখ দু-গাল জলে ভেজা,

কিন্তু আবার চেঁচায়, 'মা করছে না কেন।'

শৌরীন্দ্র গান থামিয়ে হৈমকে বলে, 'এই মা, করো করো।'

হৈম এক ঝটকায় ছেলেকে বুকে তুলে, তার গালে ঠোঁট ডুবিয়ে, প্রায় গড়িয়ে বিছানা থেকে নামে, 'তা হলে তুমিও করো ঘোঁতন।'

শৌরীন্দ্র লেফ্‌ট-রাইট করেই যাচ্ছিল, হৈম তার পাশে দাঁড়াতে ঘোঁতন হেঁচড়ে মার কোল থেকে নেমে যায়, তারপর মা-বাবার পাশে দাঁড়িয়ে লেফ্‌ট-রাইট করতে থাকে. হৈম আর শৌরীন্দ্র গেয়ে যায়, 'বাজে মাদল, নিম্নে উতলা…'

অফিসে বেশ একটা জরুরি কাজের চাপ ছিল। সত্তরের দশকে কলকাতা-মেট্রোপলিটান এলাকার গাড়ি-ঘোড়া ও যানবাহনের পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে। বৌবাজার, বড়বাজার, ধর্মতলার, অর্থাৎ রাইটার্সকে বেড় দিয়ে রাখা কলকাতার ট্র্যাফিকের একেবারে কেন্দ্রে, ট্রাভেল টাইম রেট আর ট্র্যাফিক ভলুমের স্টাডি-রিপোর্ট নিয়ে সারভেয়ারদের সঙ্গে একটা বৈঠক ছিল। তাতে, স্টেট ট্রান্স.পার্টের এক জন এঞ্জিনিয়ারও এসেছিলেন। চুরি-ডাকাতি, বর্গি আর যুদ্ধের ভয়ে তখনকার গড়কে ঘিরে যে-কলকাতা তৈরি হয়েছে সেটাই এই এখনকার কলকাতারও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। দিনের সব চেয়ে ব্যস্ত সময়ে যে-আমড়াতলা আর খ্যাংরাপট্টি আর চীনাবাজার দিয়ে একটা লোকের হেঁটে যেতে, স্বাভাবিক সময়ের তিনগুণ লাগে, শৌরীন্দ্রকে বসে-বসে সেই এলাকার 'দ্রুত' ও 'ধীর' যানবাহনের গতায়াতের অঙ্কের প্যাঁচ মেটাতে হয়। সেই বৈঠক সেরে ঘরে ফিরতেই একজন ঢুকে খবর দেয় আজ রাতে তার বাড়িতে কেউ 'শেলটার' নিতে পারে। 'বিকাশ', এই নামটা বলেছিল। খবরটা দিয়েই চলে যায় আর শৌরীন্দ্রের মন অসহায় বিরক্তিতে ভরে ওঠে। লোকটি বেরিয়ে যাওয়ার পরই, চলনসই কত কারণ শৌরীন্দ্রের মনে পড়ে যায়, তার বাড়িতে কাউকে এ-রকম না-রাখার। কিন্তু সে-সব ত শৌরীন্দ্র কাউকে জানাতেও পারবে না। খবর কোথায় জানাতে হয়, সে-সব ত কিছুই তার জানা নেই। সে এক সঞ্জয়কে বলতে পারে। কারণ, গত দু-বছরে সঞ্জয়ই বার-কয়েক তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গিয়েছে, একবার বক্তৃতা করতে নিয়ে গিয়েছিল চীনদেশের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ওপর, আর গোটা তিনেক লেখা লিখিয়েছে

এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির অর্থনীতি ও তাদের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধের ওপর। কিন্তু সঞ্জয়কে খুঁজে বের করা তার পক্ষে অসম্ভব। সঞ্জয়ের কাছ থেকেই খবরটি এসেছে এমন একটা আন্দাজও তার ছিল।

টাকা দিতে তার আপত্তি নেই, বরং টাকা সে দিতেই চায়। লেখালেখির ব্যাপারও না হয় চলতে পারে। কিন্তু বাড়িতে কাউকে লুকিয়ে রাখার নানা অসুবিধে। আজকালকার ছোট ফ্ল্যাটের অসুবিধেই শুধু নয়, ছেলেটি যদি তার বাড়ি থেকে ধরা পড়ে সে-দায় ত তারই, অথচ, সে জানেই না, তেমন হলে, তাকে কী করতে হবে, কাকে জানাতে হবে। কিছুই না জেনে একটি ছেলেকে বাড়ির ভেতরে কয়েকদিন রেখে দেয়া—।

শৌরীন্দ্র যদি ছেলেটিকে না রাখে তা হলে সে শত্রু হিশেবে চিহ্নিত হবে। আবার, তার বাড়িতে ছেলেটির যদি কোনো বিপদ ঘটে সে-দায়ও তার। ফলে ছেলেটিকে তার বাড়িতে রাখতে হবে কিছুটা বাধ্য হয়েই, যেন-বা অংশত ভয়ে আর অংশত হুকুমে। মুক্ত এলাকা আর বিপ্লবী ত্রাসের রাজনীতি-তে পূর্ণ আস্থা সত্ত্বেও, আবার-এক ভোট হবে—সেই ভোট বানচাল করে এই-সব গণতন্ত্র-মার্কা রাজনীতি থেকে লোকজনকে মোহমুক্ত করার কার্যসূচিতে পূর্ণ সমর্থন সত্ত্বেও, এ-সবেরই এক কর্মীকে তার বাড়িতে রাখতে হবে খানিকটা ভয়ে আর হুকুমে—এতে যেন এই সম্পূর্ণ কর্মকাণ্ড থেকেই সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই বিচ্ছিন্নতার ভেতর কোনো আত্মবিশ্বাস নেই। শৌরীন্দ্রের সব কিছুই হয়ে পড়ে আত্মরক্ষার তাগিদ।

অথচ শান্ত, স্থির আত্মবিশ্বাসই ত তার এতদিনকার একমাত্র সম্বল। পরীক্ষা নিয়ে ছাত্রজীবনে সে কোনোদিন ভাবনাচিন্তা করে নি। অনায়াসেই ভাল ফল করে গেছে এম এ পর্যন্ত। তারপর আমেরিকাতেও চলে গেছে অনায়াসেই। আমেরিকা না হয়ে নেদারল্যাণ্ডস বা ইউ-কেও যেতে পারত, তবে আমেরিকায় খবরাখবরের সুযোগ-সুবিধে অনেক বেশি। চার-পাঁচ বছরে ডক্টরেট ও একটু-আধটু চাকরি করে ফিরে এসে প্রথমে বর্ধমানে রিডারের পদে যোগ দেয়, সে-ও অনায়াসেই। ছোট বোন শ্যামলী আর হৈম শান্তিনিকেতনে একসঙ্গে পড়ত। শ্যামলীর ইচ্ছে ছিল দাদার সঙ্গে হৈমর বিয়ে দেয়। হৈমর মা-বাবার আপত্তি

তার পর বিয়েও হয়ে যায় অনায়াসেই। সাতষট্টি সালের শেষের দিকে, তখনকার সরকার এই নতুন সংস্থার পত্তন করে। তখন সে এখানে চলে এল, অনায়াসেই। লেখাপড়া চাকরিবাকরি বিয়েথাওয়া এই সব নিয়ে তার ভাবনাচিন্তা বা মেহনতের কিছু কোনোদিন ব্যয় করতে হয় নি বলে, তার আত্মবিশ্বাসটি শৌরীন্দ্র বেশ অটুটই রেখে গেছে বরাবর। বাষট্টি সালের যুদ্ধের সময়ে সে দেশের বাইরে ছিল। কিন্তু সেই সুযোগে অনেক রকম তথ্যও তার জানার সুযোগ বেশি ছিল। বিয়ের পর, হৈমর কাছে গল্প শুনত, যুদ্ধের সময় শান্তিনিকেতনে কী-কী কাণ্ড হত। ঐ যুদ্ধের সময় দেশের ভেতরকার ব্যাপারটা তাকে আন্দাজ করেই চালাতে হয়। কিন্তু তার পর থেকে, দেশের ভেতরের সব ব্যাপারে, শৌরীন্দ্র, তার সেই অটুট আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই, মত দিয়ে যেতে পারে। সত্তরের দশকে কলকাতার গাড়িঘোড়া-যানবাহনের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা ছকতে-ছকতে, সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার শ্রেণীসংগ্রামে, তার এই মুহূর্তের কাজ—একটি না-জানা ছেলেকে তার বাড়িতে রাখা—জানা হয়ে গেলে, শৌরীন্দ্রের আত্মবিশ্বাসটা চিনির ড্যালার মতো এলিয়ে যায়।

কী তার নিজের ব্যাপারে, কী তার পরিবারের ব্যাপারে, আর কী তার সমাজ বা দেশের ব্যাপারে, ইতিকর্তব্য নিয়ে শৌরীন্দ্রকে ত কখনো সংশয়ে ভুগতে হয় নি। এমন-কি, গোঁফ না-রাখা, চুল ছোট করে ছাঁটা, খুব হালকা রঙের হাফশার্ট আর মাঝারি ঘেরের প্যান্ট পরা—পোশাক-আশাকেও শৌরীন্দ্র এমন একটি নিঃসংশয়তার রপ্ত যে তার মতো পুরুষমানুষের সাজগোছের রকমারি অদলবদল তাকে স্পর্শ করে না। এই সব কারণেই শৌরীন্দ্রকে অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরতে হয়েছিল, পাড়ার অবস্থা কী দেখতে, হৈমকে খবরটা দিতে। কিন্তু হৈমকে সে খবরটাই যে বলে উঠতে পারে না।

সন্ধ্যার মুখোমুখি হৈম বলে, চলো, বাজারটা একটু ঘুরে আসি।'

'আবার বাজার, এই সন্ধ্যাবেলায়?'

'তা হলে তুমি বরং ঘোঁতনকে নিয়ে বাড়িতে বসো, আমি বাজারটা সেরে আসি।'

'চলো, সবাই মিলেই ঘুরে আসি,' শৌরীন্দ্রের মনে হয় রাস্তায় বোধ হয় সুবিধে

হবে, কথাটা বলার।

শাড়ি বদলাতে-বদলাতে তার ঘর থেকে হৈম বলে, 'তুমি ঘোঁতনকে তৈরি করে নাও না, চলো, গিয়ে দেখব বাজার বন্ধ'।

'ঘোঁতনা আয়, বেড়াতে যাব। কেন?' শৌরীন্দ্র একই সঙ্গে ঘোঁতনকে ডাকে, হৈমকে শুধোয়।

'ঢাকুরিয়া আর আনোয়ার শায়ে নাকি পুলিশের কী সব হচ্ছে, সেই ধাক্কায় এখন হয়ত এখানকার বাজারও বন্ধ।'

'বাবা, তুমি কী পরে যাবে?

'আমি ত পরেই আছি, পাঞ্জাবি পরে নেব',

এখুনি বলা যায়, খবরও দিয়েছে একজন, রাতে আসতে পারে, মুখ খোলার আগেই হৈমর গলা আবার ভেসে আসে, 'এই যে বেডসাইডের নীচে ওর পাজামা-পাঞ্জাবি আছে।'

শৌরীন্দ্রকে হল থেকে উঠে ঘরে গিয়ে বেডসাইডের ডালা খুলতে হয় আর অমনি ঘোঁতনের জামা-কাপড় গড়িয়ে আসে। হৈম তখনই ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। খবরটা হৈমকে না দিয়ে-দিয়ে কি শৌরীন্দ্র সেই বিপজ্জনক সময়ে পৌঁছচ্ছে না, যখন হয়ত ছেলেটিই এসে হাজির হবে? তারা যখন বাজারে, তখন যদি ছেলেটি আসে। তার পক্ষে ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একেবারেই নিরাপদ নয়। শৌরীন্দ্রের পক্ষে অবিশ্যি সেটাই সব চেয়ে নিরাপদ—এসে দেখে, সে কী করবে? কিন্তু তাতে হৈম ত আরও সাত-পাঁচ ভাবতে পারে। তার আত্মবিশ্বাসটা চিনির ড্যালার মতো এলিয়ে গিয়েছিল, এখন গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে—টের পায়।

'বাবা দেখো, দেখো', জামা-কাপড়ের ডাঁই থেকে চোখ তুলে শৌরীন্দ্র দেখে, সামনে ঘোঁতন উদোম ন্যাংটো।

নিজের পেটে দুটো চড় মেরে ঘোঁতন বলে, 'আমি কেমন নিজে নিজে জামা-প্যান্ট খুলতে পারি, বাবা?'

'তাই ত দেখছি, তুই এত বড় হয়ে গেলি কবে', ন্যাংটো ছেলেকে কাছে টেনে শৌরীন্দ্র তার পাছায় একটা চুমু খায়, একটু চড় মারে। বাবার বুকের

ভেতর থেকে ঘেঁাতন বলে, 'মিসাম্মা ছোট আর আমি বড়। না বাবা ?'

'তুমি ত বড়ই, কিন্তু মিসাম্মাটা কে ?'

'বাবা, তুমি না, কিচ্ছু জানো না, মিসাম্মা আমার বন্ধু।'

'আমাকে ত তুমি চিনিয়ে দাও নি, কী করে চিনব ?'

'দাঁড়াও চিনিয়ে দিচ্ছি, মিসাম্মাকে ডেকে আনি', বাবার বুকের ভেতর থেকে ঘেঁাতন পিছলে বেরিয়ে যায়।

হৈম ঘরে ঢোকে, 'কী হল, বাপ-ছেলেতে মিলে পাজামা-পাঞ্জাবি পেলে না ?' হৈম শৌরীন্দ্রের সামনে দাঁড়ায়। মেঝে থেকে শৌরীন্দ্র হৈমকে বেয়ে চোখ তোলে। হৈমর চোখ নামানো। শৌরীন্দ্র হৈমর চোখের পাতার জালি দেখতে পায়। হৈমর গালে তার চোখের পাতার ছায়া। এত কাছে, এত উঁচু থেকে হৈম তার চোখের নজর কোথায় ফেলে রাখে। হৈমর দাঁড়ানো শরীরটা বাঁ গোড়ালির ওপর সরল নেমে আসে। বাঁ হাঁটুটা প্রায় মেঝে পর্যন্ত ঢেলে, খাড়া ডান হাঁটুর পাশ বেয়ে হৈম জামা-কাপড়ের পাঁজায় আঙুল চালায়। ঘেঁাতনের জামা-কাপড় পেয়ে গিয়ে, ডাকে, 'ঘেঁাতন'। ঘেঁাতন আসে না দেখে, 'কী হল' বলে হৈম ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। ঘেঁাতনের জামা-কাপড়ের পাঁজার ভেতর শৌরীন্দ্র বসে। খাটের পাশে, মাটিতে, বেতসাইডের সামনে এ-রকম বসে শৌরীন্দ্র যেন ঘরটার হঠাৎ শূন্যতাটা বুঝে ফেলে। এটুকু বাড়িতে ঘেঁাতন আর যাবে কোথায় ? অত বড় জরুরি খবরটা বলতে পারছে না, সেই উদ্বেগ ভুলে গিয়ে, তার কাছে প্রধান হয়ে ওঠে হৈম আর তার মুখোমুখি না-হওয়াটা। শাড়ি বদলাতে গিয়েই কি হৈম একটু আলাদা হয়ে যায়, যেমন যায় আজকালই ? আজ বিকেলে শৌরীন্দ্রের বাড়ি-ফেরার বেরুটিনে হৈমর এই একটু আড়াল, ধরা পড়ে যায় নাকি ?

বাইরে থেকেই হৈমর গলা ঘরটাকে ভরিয়ে দেয়, 'এ-রকম উদোম হয়ে মিসাম্মাদের বাড়িতে গেলে মিসাম্মা কী ভাববে ? ঘেঁাতনটা নোংরা, গন্ধ, জামা পরে নি, প্যান্ট পরে নি,' উঁচুগলায় হৈমর স্বরে কেমন দ্বিধা জড়িয়ে যায়। তার এই উঁচুগলায় এই ঘরের শূন্যতার অর্থটাও দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে।

ছেলেকে পাকড়ে এনে হৈম বলে, 'দেখো, ছেলের কাণ্ড।'

ঘেঁাতন এক ঝটকায় মায়ের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে বাবার সামনে

কোমরে দু হাত দিয়ে দাঁড়ায়, 'মা না, বাবা, মা-টা কি বোকা! মিসাম্মাও নেংকু হয়ে বাথরুমে যায়, আমি কি ওকে পচা বলি? গন্ধ বলি?'

শৌরীন্দ্র হো-হো হেসে ওঠে, 'তুই এত কথা শিখলি কোথায়?'

'বাবা, আমি অনেক কথা জানি, তোমাকে শিখিয়ে দেব মাকে শিখিয়ে দেব না, দাও, পাজামাটা পরিয়ে দাও।'

ঘাড় ঘুরিয়ে শৌরীন্দ্র দেখে দরজার কাছে ঠোঁটময় হাসি নিয়ে হৈম ছেলের দিকে তাকিয়ে। সে দৃষ্টিতে শৌরীন্দ্রও ধরা ছিল। শৌরীন্দ্র পাজামাটা ফাঁক করে ধরে। তার কাঁধ ধরে ঘোঁতন পাজামার ফাঁকে বাঁ পা গলাতে চায় কিন্তু ফাঁকটা পায় না। তখন খিলখিল হাসে। হৈম বেরিয়ে যায়।

আবার ঘুরে এসে বলে, 'পাউডারের কৌটোটা রাখলি কোথায়। ওহ্, এই কৌটো ছাড়া ঘোঁতনের আর খেলা নেই।' চৌকির তলা থেকে কৌটোটা বের করে শৌরীন্দ্রকে দিতে-দিতে বলে, 'পাউডারটা মাখিয়ে দিও।' হৈমর হাত থেকে কৌটোটা নিতে গিয়ে শৌরীন্দ্রের হাতটা নড়ে যায়। ঘোঁতনের ডান পা তোলা, সে টলে গিয়ে বাবার কাঁধ চেপে ধরে। ঘোঁতন ডান পা-টা বাঁ পায়ের ফোকরেই ঢুকিয়ে যায়। শৌরীন্দ্র 'এই এই' বলে পাজামাটা নামিয়ে দেয়। ঘোঁতনও পা নামিয়ে ফেলে।

'ধরো বাবা।'

'পা বের করো,' ঘোঁতন পা বের করে। শৌরীন্দ্র আবার ফাঁক করে ধরে। ঘোঁতন আবার ডান পা, বাঁ পায়ের ফোকরের মধ্যে ঢোকাতে যায়। শৌরীন্দ্র একহাতে ঘোঁতনের পা টা ধরে পাজামার ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। আর বলে, 'শয়তানি!'

'শয়তানি কী বাবা। আমি শয়তানি?'

'হ্যাঁ।'

'আর মিসাম্মা? মিসাম্মা ভাল? শয়তানি খারাপ বাবা?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি আমাকে খারাপ বললে, বাবা?'

'না, খারাপ বলি নি, আদর করেছি।'

'কই হাম দিলে না?'

'এই দিলাম হাম।'

'বলো আমার সোনা আমার ফুচাই।'

'কে বলে এ সব?'

'মা বলে আর আদর করে।'

'আমি ও-সব বলতে পারি না, আমার এমনি-এমনি আদর। দাঁড়াও, এখন পাউডার মাখা হবে।'

কৌটো থেকে হাতে পাউডার ঢালতে-ঢালতে শৌরীন্দ্র ভাবে খুব কাছে আসার এও এক রীতি আছে হৈমর, তখন চোখে চোখ মেলায় না, সরাসরি কথা বলে না। 'হাত ওপরে তোলো।' ঘেঁাতন হাত ওপরে তোলে। তার বগলে, চিবুকের নীচে, মেরুদণ্ডের খাঁজে, ঘাড়ে শৌরীন্দ্র পাউডার দেয়।

'বাবা, এবার আমি তোমাকে পাউডার দেব।'

'পরে দিস, এখন তাড়াতাড়ি চল, মা বকবে!'

'দিক না। নইলে ছাড়বে না,' দরজা থেকে হৈম বলে। এই সময়টা জুড়ে হৈম ঘরে ঢুকছিল আর বেরুচ্ছিল। তার শাড়ির খসখস আর বাঁ পায়ের মটমট সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ায়।

ঘেঁাতন বলে, 'বাবা, গেঞ্জি তোলো।' শৌরীন্দ্র গেঞ্জি তোলে। ঘেঁাতন এক থাবলা পাউডার শৌরীন্দ্রের পেটে আর বুকে মাখায়। 'বাবা, পেছন ফেরো', গেঞ্জি তুলে শৌরীন্দ্র পেছন ফেরে। হাতের ওপর কৌটোটা উপুড় করে ঘেঁাতন।

'ঘেঁাতন, পাউডার ফুরিয়ে গেলে কিন্তু আর পাবে না, দেরি হয়ে যাচ্ছে,' স্বরের বদলে বোঝা যায় শেষটুকু শৌরীন্দ্রকে। শৌরীন্দ্র পিঠে ঘেঁাতনের ছোট্ট হাতটুকুর স্পর্শ পায়, ছড়িয়ে স্পর্শ যায়।

'বাবা, হাত উঁচু করো', শৌরীন্দ্র হাত উঁচু করে। পেছন থেকে খিলখিলিয়ে ঘেঁাতন বাবার বগলে পাউডার দেয়।

'এঃ, সব ঘামটামের ভেতর হাত দিচ্ছে, ঘেঁাতন হাত ধুয়ে এসো।'

শৌরীন্দ্র এক লাফে ঘেঁাতনসহ উঠে দাঁড়ায়, মেঝের ওপর পাউডারের কৌটা গড়িয়ে যায়, 'ব্যস ব্যস, ঘেঁাতন জামা পরে নাও, জামা পরে নাও।'

ঘোঁতন জিজ্ঞাসা করে, 'কী বাবা? তাড়াতাড়ি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি।'

'নাও নাও, তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবি পরিয়ে দাও, বাবা এটা ত পাঞ্জাবি? না?'

'হ্যাঁ পাঞ্জাবি।'

'বাবা, মিসান্মা ত মেয়ে, ও পাঞ্জাবি পরে না, না?'

'না। আজকাল মেয়েরাও পরে।'

'বাবা তুমি ভীষণ বোকা।'

'কেন রে?'

'তুমি বলো মেয়েরা পাঞ্জাবি পরে?'

'আজকাল পরে।'

'আজ পরবে, আবার কালও পরবে?'

'পরশুও পরবে', নিজে পাঞ্জাবি গলিয়ে ছেলেকে কোলে নিয়ে শৌরীন্দ্র তাড়াতাড়ি দরজার দিকে যায়।

'আজও পরবে, কালও পরবে, পরশুও পরবে, তা হলে মেয়েরা ছেলে হয়ে যাবে না?'

'তা হলে বোধ হয় পরশু পরবে না।'

বেরিয়ে হৈম ঘোঁতনকে জিজ্ঞাসা করে, 'হাত ধুয়েছিস?'

শৌরীন্দ্র ভাবে এই রাস্তাতেই কথাটা বলে রাখা ভাল, নাকি, বাড়িতে ফিরলে? কিন্তু তারা ফেরার আগেই যদি ছেলেটা এসে দাঁড়িয়ে থাকে?

'কেন? হাত ধোব কেন মা? আমি কি ভাত খেয়েছি!'

হৈম, 'দাঁড়াও' বলে ফেরে। দরজা খুলে ভেতরে যায়। এক আঁজলা জল নিয়ে এসে ছেলের আঙুলগুলো পুঁছে দেয়, তাতে না-হয় ধোয়া, না হয় পোছা। দরজা বন্ধ করে ওরা আবার রওনা হলে তার ভেজা-ভেজা আঙুলে শৌরীন্দ্রের আর হৈমর হাত ধরে ঘোঁতন বলে, 'মা, বাবার গায়ে হাত দিলে হাত ধুতে হয়?'

'ঘামে ত নোংরা থাকে।'

'বাবা কেন হাত ধুলো না মা? বাবা, তুমি নোংরা, তুমি কেন হাত ধোও নি,

এহ্.' ঘোঁতনের কথায় কোথায় একটু বিরতি ছিল—তাতে মনে এসে যায় সে কিছু ভেবেছে, 'মা, তোমার গায়ে হাত দিলে হাত ধোব না, তুমি ইষ্টি লাম্‌ণি মাম্‌ণি।'

'আমি তা বলি নি ঘোঁতন, ঘাম ত নোংরা, নোংরায় হাত দিলে হাত ধুতে হয়।'

'ঘোঁতন, আমি ফিরে এসে সাবান দিয়ে হাত ধোব,' শৌরীন্দ্র হৈমকে অস্বস্তি থেকে মুক্তি দিতে চায়।

'কেন ? তুমি কেন হাত ধোবে ? বাবা ?'

শৌরীন্দ্র খুব ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'তোমার গায়ে ঘাম ছিল, আমি তোমার গায়ে পাউডার দিয়ে দিয়েছি, সেইজন্য হাত ধোব।'

রাস্তায় লোকজন যেন একটু কমই। সন্ধ্যার মুখে-মুখে এ রাস্তা ত কমবয়সী মেয়েদের ধীর ভিড়ে জলজল করে। সবার মনেই একটা ভয় ঢুকেছে—তার ওপর এই অঞ্চলে পুলিশ যা করছে।

বিকেলের বাজারটা একটু বড়ই বসে। বাজারের আগে থেকেই রাস্তার দুই ধারে সারি দিয়ে গ্রামের মেয়েরা বসে। আগে এরা সবাই গড়িয়াহাটে চলে যেত। যোধপুর পার্ক হওয়ায় ঢাকুরিয়ার স্টেশন থেকে ঝুড়ি মাথায় হেঁটেই চলে আসতে পারে। বোধ হয় অফিসবাবুরা ফিরে গিন্নিদের নিয়ে বিকেলে বাজার করে বলে বিকেলের বাজারটাই জমজমাট। আবার, সকালে গড়িয়াহাট বাজারে যা বিক্রি হয় না, তা নিয়েও অনেকে এই বাজারে বসে যেতে পারে। গড়িয়াহাটের গোহাটার মত বাজারে ফড়ে ছাড়া উপায় নেই। যোধপুর পার্কের মত একটা পয়সাঅলা জায়গা হওয়ায় দক্ষিণের চাষিবউদের সরাসরি জিনিশ বেচার সুবিধে হয়েছে ফড়ে নেই। এ-ছাড়াও সব চেয়ে বড় সুবিধে, তরিতরকারি দেখতে একটু ঘন সবুজ আর শাকসবজির গোড়ায় মাটি লেগে থাকলে, এখানকার বাবুরা গিন্নিরা পয়সা ঢেলে দিতে চায়। যোধপুর পার্কের মত এরকম একটা জায়গা দক্ষিণের এই চাষিবউদের কাছে যেন গাই-বাছুর। কচি-কচি ঘাস, নতুন খৈল আর জাবনা দিয়ে গায়ে-গতরে বাড়ালে দুধ দেয় ভাল, বেশ রসাল-আঠাল টাটকা দুধ, যে-দুধ রেললাইন ছুঁইয়ে দক্ষিণের গ্রামগুলোতে যেতে পারে।

একটা ট্রেন শব্দ তুলে চলে যায়, দুটো বোমা ফাটে, যেন ট্রেনটাই বোমা ফাটাল। এক বুড়ি কয়েক ভাগা বক ফুল একটা ত্যানার ওপর পেতে, বসে ছিল।

'বক ফুল কিনবে?'

'না। অতশত টুকটাক করা যায় না।'

'মা, কেনো না, ফুল কেনো।'

শৌরীন্দ্র পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিয়ে দেখে, পয়সা আনে নি।

'পাঁচটা পয়সা দাও না', হৈমকে বলে।

হৈম উল্টোদিকের লোকটার ঝুড়ি থেকে ছোট বেগুন বাছছিল। শুনতে পায় নি। ঘেঁাতন গিয়ে তাকে পেছন থেকে টানে, 'মা, মা, বাবা পয়সা চাইছে।' না-উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে হৈম দেখে শৌরীন্দ্র তাকিয়ে। ব্যাগ খুলে একটা টাকা ঘেঁাতনের হাতে দেয়।

এক ভাগ বক ফুল কিনে ঘেঁাতনের হাতে দেয় শৌরীন্দ্র। বুড়ি টাকার ভাঙানি দিতে পারে না। পাশের দোকানির কাছে চাইলে সে বলে, 'নেই'। শৌরীন্দ্র অগত্যা টাকাটা ফেরত নিয়ে বলে, 'দাঁড়াও দিয়ে যাচ্ছি।'

ঘেঁাতন বলতে থাকে, 'বাবা, টাকাটা নিয়ে নিলে কেন, বাবা, টাকাটা নিয়ে নিলে কেন?'

'দাঁড়া, মা আসুন, পয়সা দিতে হবে,' হৈমর বেগুন কেনা হয়ে গিয়েছিল, সে ব্যাগ ঝুলিয়ে আসে। শৌরীন্দ্র হাত বাড়িয়ে বাজারের ব্যাগটা নিয়ে নেয়।

'মা দিদাকে পয়সা দাও', ঘেঁাতন আবার মাকে টানাটানি করে।

'হ্যাঁ, দশটা পয়সা দাও ত ওকে।'

ঘেঁাতন বলতে থাকে, 'আমাকে দাও, আমি দেব, আমাকে দাও।'

ঘেঁাতন বুড়ির হাতে পয়সাটা দিলে বুড়ি বাঁ হাতে তার হাতটা ধরে ডান হাতে চিবুকে চুমু খায়, চুমুর হাতটা ঘেঁাতনের মাথায় বুলিয়ে একটা বকফুল তুলে ঘেঁাতনের হাতে দেয়, 'মোকে দিদা কয়েছ বাবা, আয়ু হোক, আয়ু হোক।'

শৌরীন্দ্র দেখে, হৈম তার সেই মূর্তির মতো হাসিটা নিয়ে বুড়ির দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে—যেন এই দৃশ্যের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই, যেন ঘেঁাতন আর-কারও ছেলে। বুড়ি তখন সম্পূর্ণ বিপরীতে ঘাড় ঘুরিয়ে। তার সামনের ত্যানার কয়েক

ভাগ্য বক ফুল আর হৈম-শৌরীন্দ্র ইত্যাদি সমস্ত কিছুকে তুচ্ছ করে দিয়েছে। ঘেঁাতন দৌড়ে এসে মায়ের কোলে মুখ লুকোয়। হৈম বুড়ির দিকে তাকিয়ে থেকে ছেলের মাথায় হাত রাখে।

হৈমর একটা বাঁধা ডিমের দোকান আছে--শেডের ভেতরে। শেডে ঢুকবার কোলাপসিবল গেট একদিকে টানা। এই ভরা বাজারে তেমন ত থাকে না। হৈম গেটটা পেরিয়ে দোকানটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ছেলেটি একটি-একটি করে ডিম তুলে আলোতে দেখে ঠোঙায় রাখে। হৈম বলে, 'দশটা', একটু পরে আবার বলে, 'আচ্ছা, বিশটাই দাও'। ব্যাগের ভেতর হাত ডুবিয়ে হৈম এমন আলগা তাকায়, শৌরীন্দ্র বোঝে, সে হিশেব কষছে।

'জোড়া কত করে?'

হৈম জবাব দেয়, 'চুরাশি'।

'না দিদি, নব্বই।'

'সে কি, এর ভেতর ছ-পয়সা দাম একেবারে বাড়ল?'

'না দিদি আমার কেনা দামও বেশি, এগুলো বড় ডিম, এক টাকা জোড়া বেচছি, আপনি বলে নব্বই-এ দিচ্ছি।'

'ন-টাকা—বিশটির দাম', শৌরীন্দ্রের এই কথাটাকে সম্পূর্ণ করে এত জোরে বোমা ফাটে হৈমর হাত থেকে একটা কোনো পয়সা পড়ে যায়, ঘেঁাতন হৈমর পা জড়িয়ে ধরে।

ভেতরের চমকটা লুকিয়ে শৌরীন্দ্র বলে, 'ন টাকা, বিশটার দাম'।

দোকানের ছেলেটি কোলাপসিবল গেটের দিকে তাকায়। হৈমকে জিজ্ঞেস করে, 'দিদির বাজার হয়ে গিয়েছে?'

'হ্যাঁ, আর-একজোড়া দিয়ে দাও', হৈম দশটাকার একটি নোট এগিয়ে দেয়।

ঠোঙাটি এগিয়ে দিতে-দিতে ছেলেটি বলে, 'খোকা সঙ্গে আছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি যান, সারাদিন যা চলছে, আবার হয়ত এক্ষুনি লাগবে?'

'কেন?' ঘেঁাতনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে হৈম জিজ্ঞেস করে। শৌরীন্দ্র ব্যাগের ভেতর ডিম ঢোকাচ্ছিল।

শুনলেন না? ঢাকুরিয়া আর কাঁকুলিয়ায় কাল সকাল না রাত থেকে

সি-আর-পি ঢুকছে। বাড়ি-বাড়ি তল্লাসি করছে। এর মধ্যেই সি-আর-পির গাড়ির ওপর নাকি বোমা পড়ছে। এই ত আপনারা আসার মিনিট দশেক আগে আমাদের শেডের পেছনেই দু পক্ষের বন্দুকযুদ্ধ হয়ে গেল।'

যেন এই খবরে তার কোনো আগ্রহ নেই, গৌরীন্দ্র একটু সরে দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এখনো হৈমকে বলা হয় নি। এত বোমা বন্দুকের আওয়াজ আর গল্প শোনার পর যখন হৈম জানবে, তার বাড়িতে এই সব যুদ্ধেরই কেউ একজন এসে লুকিয়ে থাকবে?

হৈম ঘোঁতনকে কোলে তুলে নেয়, 'বাজার যে চলছে?' হৈমর প্রশ্নটার কারণ বোঝা যায় না—সে কি চায় ডিমঅলা ছেলেটির গল্পটা মিথ্যা হোক, নাকি সে যুদ্ধক্ষেত্রে বাজার বসা, বা বাজারে যুদ্ধ করা এই দুই বিপরীতকে শুধু উচ্চারণে আনে!

'আপনাদেরও কিনতে হবে, আমাদেরও বেচতে হবে দিদি', অন্য সময় ছেলেটির মুখে এই উক্তি মানাত না, ছেলেটির দার্শনিকতায় তার দেশ, পূর্ববঙ্গ, চকিতে দেখা দেয়, জিভে যে-'দেশ' প্রায় ক্ষয়ে যাচ্ছে। 'দেখেন না, দরজাটা অর্ধেক টানা।'

'হ্যাঁ—আ', হৈম আর খোকনের মুখ দুটো পাশাপাশি, আত্মবিস্মৃত, যেন ওরা ভয়ের গল্প শুনে ভয় পেতে চাইছে, ভয়টা এত বেশি সত্য ও মিথ্যা।

'গোলমাল লাগলেই আটকাতে হবে।'

'কেন।'

'না হলে ত বাজারশুদ্ধু এই শেডে ঢুকবে। বিপদের মুখে গরু-বাছুর দড়ি ছেঁড়ে, গোয়াল ছাড়ে, পালায়, আর মানুষ মাথায় চালা খোঁজে।'

'ও। তুমি ওদের ঢুকতে দেবে না?'

'এক-আধজন ঢোকে ঢুকুক। কিন্তু সবাই ঢুকলে ত আমাদের ডিম চুরি যাবে, ধাক্কাধাক্কিতে ভাঙবে, আমার ত এইটাই পুঁজি।'

'ও'।

'আমরা ত শেডের ভাড়া দেই দিদি।'

তীব্র গম্ভীর চমকে একটা গুলির আওয়াজ। যেন এই শেডের পেছনের

কোনো পুকুরে বড় মাছের ঘাইয়ের আওয়াজ আসে। ঘোঁতনকে আঁকড়ে ধরে গেটের দিকে যেতে-যেতে হৈম বলে, 'দেখো, একটা রিক্সা দেখো।'

ঘোঁতন মার কানের কাছে মুখ নিয়ে খুব গোপনে বলে, 'মা'

'উঁ'

'ওটাও কি ভারত ?'

'কোন্‌টা বাবা ?'

'ঐ যে যুদ্ধ চলছে',

'হ্যাঁ',

'এটাও ভারত ?' ঘোঁতন বাজারটাকেই দেখায়।

'হ্যাঁ-আ', আজ এই দ্বিতীয়বার শৌরীন্দ্র 'ভারত' শব্দটি শুনল।

বাইরে কোনো রিক্সা ছিল না। শৌরীন্দ্র বলে, 'রিক্সা ত নেই।' বাইরে রাস্তার আলোর নীচে ছড়ানো-ছিটানো ছোট-ছোট আনাজ-পাতির দোকানের আলগা কেনাবেচা, আর পা ছড়িয়ে বা হাঁটু মেলে বসা চাষিবউদের দেখে ভয় আসে না। মনই হয় না, বাজারটাকে ঘিরে, তাদের ঠিক পেছনেই, পিঠের কাছেই মানুষ মারার জন্য বোমা-গুলি চলছে। মানুষ মরছেও। একটা রিক্সা আসছে দেখে ওরা দাঁড়ায়। কাছে এলে শৌরীন্দ্র হাত তোলে। ছেলেটি মুহূর্ত ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে যায়। স্যাণ্ডো গেঞ্জি আর খুব ছোট হাফপ্যাণ্টে কালো কুচ-কুচে ছেলেটি হ্যাণ্ডেল থেকে হাত না তুলে শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, 'বাসস্ট্যাণ্ডে যাব না, ফাইট চলছে।'

'না, না, ঘোরাও, এই সামনের মোড়টায়', শৌরীন্দ্রের এই কথার ভেতরই হৈম যেন স্বগতোক্তি করে, 'তবে যে বলল রেললাইনের দিকে ?' ছেলে কোলে সে যেন যুদ্ধক্ষেত্রের অবধারিত দিগভ্রান্ত আশ্রয়হীনা।

'উঠুন'

'ঘোরাও'

'উঠুনই না'

ঘোঁতন-কোলে, উঠতে, ডান হাত দিয়ে সিটটা ধরতে হয়, সিটের বাঁ ঘেঁষে এমন বসে হৈম, শৌরীন্দ্রের কথা ভুলে গেছে যেন। শৌরীন্দ্রকে রিক্সার

পিছন ঘুরে ওদিকে গিয়ে উঠতে হয়। সিট থেকে না নেমে রিক্সাটা ঘুরিয়ে নেয় জোয়ান ছেলেটি, যেন, বড় বড় ট্রাকগাড়ির মতোই তার রিক্সা চালানোর দক্ষতার একটা পরীক্ষা গাড়িটাকে সে হাতের পাঞ্জায় খেলাতে পারে কদ্দুর আর কত জোরে সে চালাতে পারে। দূর দূরগামী ট্রাকের সামনে যেমন ঝালর ঝোলানো থাকে, রিক্সায় চকচকে হ্যাণ্ডেলে তেমনি নানা রঙের কাগজ, রাংতা, প্লাস্টিকের রঙিন ফুল।

নীল কাগজে শাদা রেখার বেশ ছিমছাম আঁকা-জোখার মতো বাড়ি-ঘর রাস্তা দিয়ে ঘেরা, আচমকা ফাঁকা প্লটে, আগুনের শিখা লকলকায়—শহরে, এই শহরে, শিখার রেখা ত এখন অলঙ্কার, ছবিতে বা নিওন-সাইনে আর সেই লেলিহানতা দলে অ্যালুমিনিয়মের দুমড়ানো হাঁড়ি কালো হয়। সারা দিনের শেষে বাড়ি তৈরির মজুররা তাদের একবারের ভাত রাঁধছে। মুদি দোকানে এখন ছোট্ট শিশি, আঁচল আর গামছার ভিড়।

তাদের মনে হয় না, এই রাস্তা তাদের পরিচিত, এইমাত্র একটু আগে তারা এই রাস্তা দিয়ে গিয়েছে। রিক্সাটা খুব জোরে ছুটছিল। ছোটখাট গর্ত এড়াতে দ্রুত হ্যাণ্ডেল ঘোরানোয় ওরা বসেও টলছিল। বাড়ির কাছাকাছি আসতে শৌরীন্দ্র বলতে পারে, 'রাতে একজন আসবে, বিকাশ বলে, অফিসে খবর দিয়েছে।'

হৈম ডিশে দলা পাকিয়ে সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছে, ঘোঁতন চেয়ারে বসে দুলে দুলে খায়। শৌরীন্দ্র আরেকটা চেয়ারে বসে। ঘোঁতন বলে, 'বাবা, আমি ত বড়, আমি নিজে-নিজে খাই, মিসাম্মা ত ছোট, মিসাম্মা পারে না।'

হৈম শোবার ঘরে কিছু করছে। শৌরীন্দ্র একটু অস্বস্তিতে আছে—কথাটা হৈম শুনেছে কিনা, আর শুনলেও বুঝেছে কিনা। ঐ নিয়ে হৈম কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে নি। এসে আগে ঘোঁতনের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। তার পর শোয়ার ঘরে গেছে। তুমি ঘোঁতনের সামনে একটু বসো—হৈম শৌরীন্দ্রকে বলে গেছে। শৌরীন্দ্র ঠিক বোঝে না, কিন্তু এত দিন এক সঙ্গে থাকতে-থাকতে দুজনার অভ্যেস ত দুজনার কিছু জানাজানি হয়ে যায়। মনের কোনো অস্থিরতায় হৈম খুব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তখন বাইরে থেকে দেখলে কেমন মনে হতে পারে, তার মনে, অস্থিরতা ত দূরের কথা, প্রায় শরীরভরা ঘুমের মতো শান্তি। অসংখ্য

টুকরো-টুকরো ছোট-ছোট খুঁটিনাটি কাজে হৈম তখন ক্রমেই বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ে —রিপু করতে, বা ঘেঁাতনের ছেঁড়া বইয়ের পাতা জুড়তে, বা তার বহু পুরনো চিঠি তারিখ অনুযায়ী সাজিয়ে ফেলতে। তখন হৈমর সঙ্গে কথা বলে কোনো লাভ নেই। হুঁ হাঁ ছাড়া কোনো জবাব দেয় না। হাতের কাজটাতে তার মগ্নতা এতই বেশি যে সেই প্রায়-নীরবতার অন্য কোনো অর্থও অনুমান করা যায় না। তার পর, অনেকটা সময় কেটে গেলে, হৈম হয়ত শাড়ির পাড়টা মেলে ধরে বলে 'দেখো ত, রিপুটা বোঝা যায় নাকি ?' মৃদু ঠোঁটে তার জিজ্ঞাসা তখন সত্যিই আন্তরিক। শৌরীন্দ্র ঠাহর পায় না, এইভাবে কি হৈম তার অস্থিরতার বিষয়টিকে ভুলে যায়, নাকি নিজের মনের চারপাশে কোনো দেয়াল গাঁথতে থাকে। বাইরে থেকে ফিরেই হৈম যে কাজেকর্মে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ল, কথাবার্তা প্রায় বললই না আর শোয়ার ঘরে ঢুকে গেল, শৌরীন্দ্র তার কারণ আন্দাজ করতে পারে না। হৈমর মনে কিছু একটা ঠিক হয়ে গেলে, সেটা বদলায় না—এতেই শৌরীন্দ্রের ভয়। হৈমর এই ঠিক করাটা এত বেশি গূঢ় সেখানে দ্বিতীয় কারো অস্তিত্ব টুকুও নেই।

'বাবা, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছ না। চুপ করে আছ কেন ?'

'তুমি খাও ঘেঁাতন, খেতে খেতে গল্প হয়।'

'তুমি ত গল্প করছ না।'

'এই ত করছি। তুমি আমাকে মিসাম্মাকে চিনিয়ে দিও।'

'আচ্ছা, চিনিয়ে দিচ্ছি, বাবা, এই যে আমাদের বাড়ি ত, এর পাশের একটা বাড়ি আছে ত, তার সামনে একটা বাড়ি আছে ত, তার দোতলা আছে ত সেই দোতলায় দাদুর ত পা ভেঙে গেছে ত, সেই দোতলার একটা একতলা আছে ত, সেই একতলায় মিসাম্মা থাকে,' ঘেঁাতন থামে, তার পর বলে, 'বাবা, এবার কার মাথা খাব ?'

'আমারটা খা।'

'তোমার মাথা খেলে আমি গল্প করব কার সঙ্গে ?'

'আচ্ছা, তা হলে মিসাম্মার মাথা খাও।'

'আহা-হা, মিসাম্মা আমার বন্ধু না ?'

'তা হলে মিসামার বউয়ের মাথা খাও।'

'হ্যাঁ।'

একটা দলা তুলে নিয়ে ঘেঁাতন মুখে পুরে দেয়। আর একটু ছোট-ছোট লা করে দেয় না কেন? ঘেঁাতনের গাল ফুলে গেছে, ঠেঁাটের ফাঁক দিয়ে ভাত বরিয়ে আসছে, মুখটা নাড়াতে পারছে না, চোখটা বড় হয়ে গেছে। শৌরীন্দ্র এখন ঘেঁাতনের সামনে বসে অপেক্ষা করে যায়। যদি এমন হয় যে বাজারে যাচ্ছিল হম খুব ঢিলেঢালা মনে, বাজার করার মত উত্তেজনাও তার ছিল না আর, াই বোমা-বন্দুকের আকস্মিকতার চোট সামলাতে তাকে এখন একটু একলা াকতে হচ্ছে, তা হলে হৈম নিজেকে ঠিক করে ঘর থেকে বেরবে। বাড়িতে াকজন আজ রাতে এসে থাকতে পারে, তার দেয়া এই খবরটা কি ঐ বোমা-ন্দুকের আঘাতের সঙ্গেই মিশে গিয়েছে? নাকি, হৈম ব্যাপারটা নিয়ে তার ঙ্গে কথা বলবে, এমন একটু-আধটু কথা, যাতে শৌরীন্দ্র তার মনের আঁচ রতে পারে।

'বাবা, দেখো, আর দুটো দলা আছে. এই দলাটা কার মাথা বাবা, জানো?' ঘেঁাতন জিজ্ঞাসা করে।

'না ত।'

'তুমি কিছু জানো না বাবা। শোনো,' ঘেঁাতন বোঝানোর ভঙ্গিতে হাতটা তোলে, 'এই দলাটা মার বউয়ের, আর এর পরের দলাটা আমার বউয়ের, বুঝলে?'

'হ্যাঁ। তা হলে খেয়ে নাও।'

'খাব ত, মাকে ডাকো।'

'কেন?'

'মার বউয়ের মাথা খাব, মা কাঁদবে না?'

'তুমি ডাকো।'

'কেন তুমি মাকে ডাকবে না? রাগ করেছ?'

'কেন রাগ করব?'

'তবে মাকে ডাকো, হৈম, হৈম বলে ডাকো।'

ঘেঁাতনের কথায় শৌরীন্দ্র গলাটা পরিষ্কার করে আর ঘেঁাতন হেসে ফেলে।

শৌরীন্দ্র কী বলে ডাকবে আর তার পর কী হবে সেটা ঘোঁতনের জানা। সেই জানা ঘটনার উত্তেজনায় ঘোঁতন হেসে থাকে।

'বাবা, ডাকো মাকে ডাকো।'

শৌরীন্দ্র ডাকতেই যায়, কিন্তু একটু সময় নেয়, কেমন মনে হয়, তার ডাকটা ঠিক-ঠিক নাও শোনাতে পারে।

'বাবা, ডাকো।'

শৌরীন্দ্র একবার ভাবে, খুব নিচু স্বরে ডাকে, যেন সে হৈমকে শোনাতে চায় না। কিন্তু তার পরই মনে হয়, তার ও ঘোঁতনের এই খেলার টানে যদি হৈম খুব স্বাভাবিক ভাবেই বেরিয়ে আসে। হৈমর স্বভাব এতই সহজ যে শৌরীন্দ্রের সন্দেহ হয় এখন, এত সাত-পাঁচ ভাবা গলায় সে অত সহজ হতে পারবে কি না। সহজেই শৌরীন্দ্রের সব চেয়ে বড় বাধা যেন।

হাঁ করে ফিসফিসিয়ে শৌরীন্দ্র ডাকে, 'হৈম, হৈম।' ঘোঁতন না শুনেই হেসে ফেলেছিল, পরে বোঝে, শৌরীন্দ্র ডাকে নি।

কাঁদো-কাঁদো গলায় বলে, 'ডাকো, মাকে ডাকো।' শৌরীন্দ্র হেসে ফেলে।

আর সেই হাসির গমকেই ডেকে ওঠে, 'ও আমার হৈ-মা, ঘোঁতনের খৈ-মা।'

ঘোঁতনের কিছু বলার আছে, এই খেলায়, এর পর, কিন্তু হাসির দমকে সে বলতে পারে না, 'ঘোঁতন হাসবে না, বলো, বলো।'

বেশিটা হাসি মিশিয়েই ঘোঁতন বলে ওঠে 'ও বাবার হৈ-মা, আমার দৈ-মা।'

শৌরীন্দ্র ডেকে ওঠে, 'ও আমার হৈ-মা আর ঘোঁতনের নাই-মা।'

খানিকটা হেসে ঘোঁতন কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'না, আমার নাই-মা না, তোমার নাই-মা।'

'আমার ত হই-মা।'

এইখানে হৈমর পার্ট আছে—সে এসে বলে, 'এই যে ঘোঁতার ছেই-মা।' কিন্তু হৈম যদি তার পার্ট না নেয়, তা হলে খেলাটা অন্য দিকে ঘুরবে। শৌরীন্দ্র আবার ডাকে, ও ঘোঁতনের নাই-মা, আমার হই-মা।'

ঘোঁতন আবার কাঁদো-কাঁদো গলায় ডাকে, 'ও আমার হাই-মা, বাবার নাই-মা।'

শোবার ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে, রান্নাঘর আর শোয়ার ঘরের মাঝখানের ফালিটাতে দাঁড়িয়ে হৈম বলে, 'কী, এত ডাকাডাকি কিসের?' খাবার টেবিলের ওপরের আলোতে রান্নাঘরের এদিকের দেয়ালের ছায়ায় হৈমর মুখ দেখতে পায় না শৌরীন্দ্র। আর স্বাভাবিকে হৈমর স্বর খুব শান্তই।

'ঘোঁতন তোমার বউয়ের মাথা খাবে বলে, তোমাকে ডাকছে।'

'এই ত এসেছি, এবার ঘোঁতন খাও।'

ঘোঁতন বলে, 'তুমি কাঁদো।'

'কাঁদলাম।'

'না। মিছিমিছি নয়, সত্যি সত্যি।'

একটু যেন ইতস্তত করে হৈম, সে কি ঘোঁতনকে খেতে বলে আবার ঘরে ঢুকে যাবে? 'মা, কাঁদো'—ঘোঁতনের হুকুমের মিথ্যা কান্নার জন্য আঁ হাত দেয় হৈম। আঁচলটা ধীরে-ধীরে তুলে চোখে চাপা দেয়। ঘোঁতন ভাতের দলাটা মুখে দেয়। হৈম আঁচলটা নামালে মুখ ভর্তি ভাত নিয়ে ঘোঁতন চেয়ারে হেলান দিয়ে, থুতনিটা গলায় লাগায়। চশমার ফাঁক দিয়ে বুড়ো মানুষের চাউনির মতো চোখটা তুলে, শুধু চোখের মণিটা ঘুরিয়ে একবার শৌরীন্দ্রের দিকে তাকায়, আরেকবার হৈমর দিকে তাকায়। ঠোঁট টিপে এমন হাসে যেন ঘোঁতন জানে হৈমকে সে তার দুঃখের নিঃসঙ্গতা থেকে বাইরে নিয়ে এল। ঘোঁতনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হৈম কি সেটাই আন্দাজ করে, ঘোঁতন তাকে কতটা বাইরে নিয়ে এল। হাসিতে ঘোঁতনের ঠোঁট খুলে গেলেই ভাত বেরিয়ে পড়বে। হৈম রান্নাঘরে ঢুকে এক গ্লাস জল এনে বলে, 'ঘোঁতন আস্তে-আস্তে খাও,' তার পর চেয়ার টেনে বসে।

শৌরীন্দ্র ধীর গলায় শুরু করে, 'সত্যি এত জায়গায় রোজ যাই, ধরো অন্তত অর্ধেকটা কলকাতা ত ঘুরতেই হয়—।' এই শেষ না-হওয়া কথাটুকুতেই হৈম হেসে ফেলে। ওদের দুজনার জানা কোনো কথা হচ্ছে—হৈমর হাসিতে মাত্র সেই স্বীকৃতিটুকুই থাকে।

'কিন্তু দুটি কখনো এক রকম দেখলাম না।'

'আচ্ছা, হয়েছে। এখন আর দরকার নেই,' হৈম ছেলের মুখে জলের গ্লাস

তোলে। আমার মন খারাপ হলে শুধু আমার প্রশংসা করবে, বলবে আমি দেখতে ভাল, আমি কাজ করি ভাল, আমার সব ভাল—হৈম একদিন, সে কতদিন আগে, শৌরীন্দ্রকে ঠাট্টা করেছিল। তাতে এমনি উপকথা রচিত হয়ে আছে দুজনের ভেতরে, যে-উপকথা কোনোদিন ফুরোয় না।

'কে আসবেন রাত্রিতে, বলছিলে?' হৈম চেয়ারে হেলান দিয়ে টেবিলের গ্লাসে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

'বললাম ত, অফিসেই শুনলাম, মানে খবর পেলাম, এই রেল লাইন ধরে গত কয়েকদিন যা হওয়ার তাই হচ্ছে। সি-আর-পি, বোধ হয় সৈন্যরাও আছে, প্রত্যেক বাড়িতে ঢুকে-ঢুকে মারধোর করছে। অল্প-য়েসি মেয়েদেরও পারলে সবাই সরিয়ে দিচ্ছে। কম বয়েসি ছেলেদের ত কথাই নেই। পেলে হয় গুলি করে মারবে নয় ত থানায় নিয়ে যাবে। যে, যেখানে পারছে গিয়ে লুকিয়ে থাকছে। আমাদের তে ডি) এক জন এসে থাকতে পারে। আজ রাতে আসবে। আবার না-ও আসতে পারে—হয়ত বেরতে পারল না, বা, বেরতে গিয়ে ধরা পলড়। অফিস থেকে ফিরলাম তোমাকে খবরটা দেব বলে, কিন্তু ভুলে গেছি,' কথা বলতে-বলতে শৌরীন্দ্র বোঝে অফিসে সে এই মপিং-এর খবর পেয়েছে, না, শেলটার-এর খবর পেয়েছে—তার কথাতে এই ব্যাপারটাই গুলিয়ে গেল। বন্যা বা আগুন-লাগা প্রতিবেশীর সাহায্যের মত নিরাপদ মানবিক শোনায় পুরো ঘটনাটা।

'কিন্তু, এ-সবই ত হচ্ছে এই ভোট নিয়ে, নাকি? ভোট হলে ক্ষতি কী, যার ইচ্ছে দেবে, যার ইচ্ছে দেবে না।'

'কিন্তু ভোটে যে-সরকারটি হবে সেটা ত এমন হবে না যে যার ইচ্ছে মানবে, যার ইচ্ছে মানবে না?'

'কিন্তু সরকার ত একটি চাই ই, নাকি?'

'সরকার থাকলে দেশের উপকার হয়—এই ধারণাটা ভাঙা দরকার। মানে ভোট দিয়েই আমরা অনেক কিছু করতে পারি এই ধারণাটাই ভাঙা দরকার। অনেকে বুঝতে পেরেছে ভোট দিয়ে সরকার বদলায় কিন্তু ব্যবস্থা বদলায় না। আর অনেকে বোঝে নি, বা তারা সব সময়ই মেনে চলার দলে।

সরকারের হাতে ক্ষমতা আছে, তাই সরকারকে মানে। বিপ্লবীদের হাতে ক্ষমতা থাকলে বিপ্লবীদের মানবে। তাই তেমন দরকারে তাদের একটু ভয় দেখাতে হয়।'

'একটা দেশে কি এ-রকম দুটো ক্ষমতা থাকে না কি?'

'চীনদেশে বিপ্লবের সময় থেকেছে। বিপ্লব ত একটা এক দিনের ঘটনা নয়, বিপ্লব ত একটা কাজ—অনেক দিন ধরে চলে যেটা। চীনদেশে এ-রকম মুক্ত এলাকা ছিল, সেখানে বিপ্লবীদের শাসন। আবার শহর-টহরে সরকারের ক্ষমতা ছিল। ভিয়েতনামেও এ-রকম ঘটেছে। আমাদের দেশেও এই রকমই ঘটছে। এটা ঘটাই ত ভাল। তা হলে বোঝা যায়। তা না হলে, যা আছে তাই থাক, এই ব্যাপার চলে। ভোটটা তেমনি একটা ব্যাপার।'

শৌরীন্দ্র এতটা বলে একটু শান্তি পায়, তার রাজনীতিক তত্ত্বটা এত পরিষ্কার বলতে পারার ভেতরে সেই আত্মবিশ্বাসের শান্তি আসে। হৈম চুপ করে থাকে। কিন্তু তত্ত্বের এত স্পষ্টতা সত্ত্বেও শৌরীন্দ্র হৈমর কাছে এটা পরিষ্কার করে দিতে পারে না যে তার বাড়িতে যে-ছেলেটি আসবে, সে আত্মরক্ষার তাড়াতেই পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে আসছে, না কি সে পাল্টা-ক্ষমতা তৈরির কর্মী। এটা যে শৌরীন্দ্র বলে দিতে পারে না, সে কি শুধু এই কারণে যে নিজেরও অজ্ঞাতে শৌরীন্দ্র একটু সাবধান হয়ে যেতে চায় অথবা শেষ পর্যন্ত তার বাড়িতে একটি ছেলেকে শেলটার দিতে হচ্ছে এই ঘটনাটি এখনো তার কাছে যথেষ্ট ভাল লাগে না। তত্ত্বের এক জিজ্ঞাসার উত্তরে শৌরীন্দ্র যখন তার স্বাভাবিক আত্মস্থতায় সহজ হয়ে উঠতে পারে, তার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে নেহাতই একটা ঘটনার সম্ভাবনায় সে কেমন অস্থির থেকে যায়। 'তুমি ত, এই ভোট যেন না হয়, তাই চাও?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে সরকার ত তোমাকেও ধরতে পারে। তার ওপর তুমি সরকারি চাকরি কর।'

'হ্যাঁ। ধরতে পারে। কিন্তু আমার যা চাকরি সেটা ত আমি ভালভাবেই করি। এটা ত চাকরির ব্যাপার না, এ ত বিশ্বাসের ব্যাপার, মানে ইতিহাসের ব্যাপার, যে-ইতিহাস ঘটছে। তাতে একজন কি বিশ্বাস করবে আর না করবে

তাই নিয়ে কি সরকারি হুকুম চলে?' এই কথাগুলিতে হৈমর প্রতি আশ্বাস নিহিত ছিল।

শৌরীন্দ্রের ওপর চোখ রেখে হৈম জিজ্ঞাসা করে, 'এই পুলিশ-টুলিশ তা হলে যারা কাজ করছে তাদেরই জন্য?'

'পুলিশ ত আর কারো জন্য নয়, পুলিশ আর সৈন্য রাখা হয় মারবার জন্য, ভয় দেখাবার জন্য, লোকজনকে টিট করতে,' পুলিশের কাজের ব্যাখ্যায় শৌরীন্দ্র তার শান্তভাব বজায় রাখতে না পেরে একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। এই একটু আগে হৈমকে নিয়ে শৌরীন্দ্রের যে অনিশ্চয়তা ছিল, এখন, সে নিজেই যেন সেই অনিশ্চয়তায় ভুগতে শুরু করে।

হৈম জিজ্ঞাসা করে, 'এলে কি রাতেই আসবে?'

ঘোঁতন জিজ্ঞাসা করে, 'কে আসবে মা, কে আসবে?'

হৈম ঘোঁতনকে, 'বলছি। ঐ ভাতটা খেয়ে নাও,' বলে শৌরীন্দ্রকে বলে, 'হি উইল গো অন টেলিং হিজ ফ্রেণ্ডস ব্যাট উই হ্যাভ এ গেস্ট, অ্যাণ্ড অল অ্যাবসার্ড স্টরিজ অ্যাবাউট হিম।'

'টেল হিম ব্যাট ওয়ান অব ইয়োর ব্রাদার্স ইজ কামিং দিস্ নাইট।'

'ঘোঁতন, তোমার বউয়ের মাথাটা খেয়ে নাও। তোমার একটা মামা আসবে।'

'কোন মামা, মা?'

'একটা নতুন মামা, আসুক, তার পর ত বুঝবে কোন মামা।'

'মা আমি ইংরেজি জানি, জানো, গ্লা ম্লি ঝিল, স্টুমি স্তিলি গি।'

বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই হৈম হাসিতে দুলে ওঠে, 'বাঃ বাঃ, তুই ত খুব ভাল ইংরেজি জানিস। কিন্তু আমি ত হিন্দি বললাম।'

'মোটেই না। বরুণরা ত হিন্দি বলে।'

'বরুণ কে?' শৌরীন্দ্র জিজ্ঞেস করে।

হৈম জবাব দেয়, 'আর-এক বন্ধু। আচ্ছা, এবার তোমার বউয়ের মাথাটা খাও।'

'তুমি ইংরেজিতে বলো, তা হলে খেয়ে নেব, বল, ম্লি ম্লি জি, গিল জিলি ভাত,

বলো মা।'

হৈম বলতে বাধ্য হয়, 'গ্লি গ্লি জি, গিল জিলি ভাত,' বলেই হৈম হাসিতে দুলে ওঠে।

ঘোঁতন তার বাবাকে বলে, 'দেখলে বাবা, মার সঙ্গে কী রকম ইংরেজি বললাম, তুমি পার না।' শেষ দলা ভাত মুখে দিয়ে ঘোঁতন চেয়ার থেকে নেমে দুলে-দুলে হাঁটে আর ঘাড় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে শৌরীন্দ্রের দিকে তাকায়, যেন সে হৈমকে ঘর থেকে বের করে এনে, আবার টেবিলে বসিয়ে, ইংরেজি বলিয়ে এমন একটা কাজ করেছে, যেটা শৌরীন্দ্র পারে নি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে হৈম বলে, 'তা হলে এই ঘরটা তৈরি করে ফেলতে হয়, উনি আসার আগেই?' আর ত্বরিত পায়ে পাশের ঘরটায় ঢুকে বেরিয়ে এসে শৌরীন্দ্রকে বলে, 'তুমি একটু ঘোঁতনকে মুখ হাত ধুইয়ে ঘরে নিয়ে এসো।' হৈমও যেন তার আর নেহাত ব্যক্তিগতের আড়ালে থাকতে চায় না, কোনো কাজ বা ভাবনার দুর্গে যেন তার খুব নিস্তার নেই, বাড়ির কাজে ঢুকে যেতে এমনি তার ব্যস্ততা। ফিরে ঝাঁটা হাতে সেই ঘরে ঢোকে—ঐ ঘর-গোছানোর কাজটা এখন যেন হৈমর অবলম্বন হয়ে ওঠে।

ঘোঁতনকে মুখ-হাত ধোয়াতে শৌরীন্দ্র শোবার ঘরের বাথরুমেই নিয়ে যায়—বাথরুম থেকে সরাসরি বিছানায়, নইলে আর ওকে বিছানায় তোলা যাবে না। হৈম ঘরে ঢোকে। কাজের সুবিধের জন্য আঁচলটা গোঁজা। যে-কোনো ব্যস্ততাতে হৈমর চোখের পাতা যেমন ঘন-ঘন পড়ে, তেমনি পড়ছে. দেখে মনে হয় চোখ পিটপিট করছে। মুখটা যেন একটু দীপ্ত ঠেকে।

ওয়াড্রোবের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে নীচের তাক থেকে হৈম একটা পাঁজা বের করে, মেঝেতে রাখে। শৌরীন্দ্র তখন বেডকভারটা টেনে, তুলে ফেলে, চাদরটা হাত দিয়ে ঝাড়ছে। পাঁজাটা নিয়ে দাঁড়িয়ে বুকে চেপে হৈম বলে, 'ঘোঁতনকে শুইয়ে তুমি এ-ঘরে এসো।'

'মা আমি যাব।'

'তুমি ত শুয়ে-শুয়ে এখন বই দেখবে, না ঘোঁতন?'

'না। এখন আমি বই দেখব না।'

'তা হলে তোমার বই-এর শকুন্তলার হরিণটার দুঃখ হবে, আজ ঘোঁতন আমাদের দেখল না। সর্বদমনের সিংহটার দুঃখ হবে, আজ ঘোঁতন আমাদের দেখল না।'

'ওদের পরে দেখব,' ঘোঁতনের মুখ মিথ্যা কান্নায় ভেঙে যায়।

শৌরীন্দ্র ক্ষীণ বলে, 'চলুক না ও-ঘরে, পরে এসে শোবে।'

ঘোঁতন মুখের কান্নায় রেখাটা মোছে না কিন্তু হাসিটা লুকনোর জন্য ওপরের ঠোঁটটাকে ভেঙে ওপরের দিকে তোলে।

কাপড়ের পাঁজা বুকে হৈম ছেলের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বলে, 'আয়, তা হলে।'

হৈম দুই পা গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার তাকিয়ে বেরিয়ে যায়। আর ঘোঁতন ঝাঁপিয়ে শৌরীন্দ্রের বুকে আসে। শৌরীন্দ্র তৈরি ছিল না, সে ধাক্কায় ঘোঁতনকে এক হাতে জড়িয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে সামলায়, 'দেখেছ কাণ্ড, পড়ে যেতি যে।'

পাশের ঘরে গিয়ে ডিভানটার ওপর নামায় ঘোঁতনকে। সেখানে সেই কাপড়ের পাঁজাটাও রেখেছে হৈম। হৈম তখন ঘোঁতনের ট্রাই-সাইকেল আর খেলনার ঝুড়িটা দরজার বাইরে রাখছিল। 'কী? এগুলো কি সব ঘরের বাইরে যাবে?'

'না, না, একটু গুছিয়ে রাখব।'

'মা এই ঘরে মামা এসে থাকবে?'

'হ্যাঁ ঘোঁতন।'

'আমরা এখন ঘরটাকে সাজাব?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি নীচে নামবে না।' দুই কোমরে হাত দিয়ে হৈম শৌরীন্দ্রের দিকে মুখটা তুলে বলে, 'এই ডিভানটাতেই হয়ে যাবে, না? নাকি লফ্‌ট্‌ থেকে খাটটা নামাবে?' শৌরীন্দ্র দেখে হৈমর কানের পেছনে ঘাড়ে গুঁড়ো চুল লেগে। সরিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু সারা ঘর নিয়ে হৈম যতটা ব্যস্ত হয়ে উঠেছে, তাতে সেই ছেলেটির আসাটা যে অনিবার্যই হয় তা-ই নয়, যেন শৌরীন্দ্র সপরিবারে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে!

শৌরীন্দ্র বলে বসে, 'এত কিছু করার কী আছে। যদি আসে ঐ ডিভানটার

ওপর একটা বিছানা পেতে দিলেই হবে।'

হৈম কোমর থেকে হাত নামিয়ে বলে, 'তা হলে থাক।'

'মা, মা, মামা কি আজ রাতে আসবে, এখুনি আসবে?'

হৈম গিয়ে ডিভানটার সামনে মেঝের ওপর বসে পড়ে, 'শোনো ঘোঁতন, তোমার একটা মামা আসবে।'

ঘোঁতনও ডিভানটার ওপর মার মুখের সামনে বসে পড়ে, 'হ্যাঁ, তার পর?'

'তার পর তোর একটা মামা আসবে।'

'হ্যাঁ, তার পর?'

'তার পর তোর একটা মামা আসবে।'

'না-আ মা, বলো,' ঘোঁতন মার মাথাটার ধাক্কা দেয়।

'গল্প শুনবি?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে ও-ঘরে চল' দাঁড়িয়ে ঘোঁতনকে কোলে নিয়ে হৈম ঘর থেকে বেরতে বেরতে বলে, 'তা হলে থাক, পরে দেখা যাবে।'

শৌরীন্দ্র ফিরে ডাকে 'যখন সব আনাই হল, লাগিয়েই দেয়া যাক, পর্দাটর্দা।'

'বেশ হোক।' হৈম ফিরে ঘোঁতনকে ডিভানটার ওপর নামায়। জানলা-দরজা থেকে পর্দার লাঠিগুলো নামিয়ে হৈম একটা ঝাড়ন দিয়ে মোছে। লাঠির পাঁজা ঘোঁতনের সামনে নামিয়ে, একটা পর্দা দিয়ে ঘোঁতনকে বলে, 'ঘোঁতন, পর্দায় লাঠি ভর।' এতগুলো লাঠি এক সঙ্গে পেয়ে ঘোঁতন অস্থির হয়ে ওঠে। সে হাতের পর্দাটার ভেতর লাঠি চালিয়ে দেয়, লাঠিটা পর্দা থেকে বেরিয়ে আসে আর পর্দাটা খসে যায়।

ঘোঁতন চিৎকার করে ওঠে, 'মা, কাঠিতে পর্দা থাকছে না।'

হৈম তখন পর্দাটা সম্পূর্ণ খুলে, তার ফাঁকটার সামনে লাঠিটা রেখে বোঝায়, 'এই ফাঁকটার ভেতর দিয়ে লাঠিটাকে ঢোকাতে হবে।'

'আচ্ছা। দাও।' ঘোঁতন মার হাত থেকে লাঠিটা আর পদাটা নিয়ে নেয়। ঘোঁতন প্রথমে ঠিক করতে পারে না, লাঠিটার ভেতর পর্দাটা টানবে, নাকি পর্দার ভেতরে লাঠিটাকে পুরবে। সে লাঠিটার মাথা আর পর্দার ফাঁকটা কাছাকাছি এনে

টলতে-টলতে বসে পড়ল। বসে পড়ে সেই পর্দা আর লাঠি নিয়ে সে সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে যায়—মগ্নতার সেই সম্পূর্ণতা একমাত্র শিশুতেই সম্ভব, মানুষেরই হোক আর পশুরই হোক। হৈম কাঠির ভেতর পর্দা পুরে, জানলাটায় ঝুলিয়ে, একটু সরে দেখে, আবার ডিভানটার ওপর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে কুঁচিগুলো ঠিক করে।

ছেলে আর মায়ের এই ব্যস্ততার পেছনে শৌরীন্দ্রের এমনি দাঁড়িয়ে থাকা, যেন এ ঘরে তার ঢোকারই কথা ছিল না। পরিবেশের অসংগতির লড়াইটা যখন হৈম তার নিজের দুর্গে ঢুকে লড়তে চায়, তখন শৌরীন্দ্রের অনিশ্চয়তা, সে দুর্গে তার, শৌরীন্দ্রর জায়গা নেই কেন। আবার যখন হৈম পরিবেশের ভেতরে ঢুকেই সেই অসংগতির শেষ ঘটাতে চায়, তখন শৌরীন্দ্রর অনিশ্চয়তা, হৈম বুঝি পরিবেশকে বড় বেশি সন্নিহিত করে তুলছে। শৌরীন্দ্রের অভ্যস্ত ও অনায়াস আত্মবিশ্বাসের চিনির ড্যালাটা ভেঙে গিয়েছিল। এখন, তাতে যেন পিঁপড়ে লাগে আর শয়ে-শয়ে, হাজারে-হাজারে, কালো পিঁপড়ে শৌরীন্দ্রের ভাঙা আত্মবিশ্বাসের দানা নিয়ে টানাটানি ছোটাছুটি করে।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হৈম জানলায় পর্দার দিকে তাকায়। তার পর ঘোঁতনের দিকে। ঘোঁতন তখনো পর্দার ফাঁকের সামনে লাঠি নাড়িয়ে যাচ্ছে। 'দেখ ঘোঁতন, এবার হয়ে যাবে,' ঘোঁতনকে পর্দা আর লাঠিটা দিতে হয় না, তার হাত থেকে খসে যায়। ঘুমভরা চোখ সে তুলতে চেষ্টা করে কিন্তু মায়ের মুখ পর্যন্ত পৌঁছয় না! লাঠিটা পর্দার ভেতর ঢুকিয়ে দরজায় ঝোলাতে-ঝোলাতে হৈম বলে, 'আজকের মতো ব্যাটারি শেষ। ওকে একটু কোলে নাও ত।' শৌরীন্দ্র ঘোঁতনকে কোলে তুলতেই তার ঘাড়ে ঘোঁতন মাথা নেতিয়ে দেয়। হৈম ডিভানটার পুরনো ঢাকনা তুলে, নতুন ঢাকনা ছড়িয়ে দেয়। ঘরের চার দিকে তাকিয়ে 'বাঃ' বলে হৈম ঘরের মাঝখানে বসে যায়।

গভীর শর্ষে রঙের ভেতর গভীর লালের পাতলা লম্বা টান—এই কাপড়গুলোর একই কাপড়ের পর্দা ও বিছানা-চাদনা। কাপড়টা ভারী। সামান্য এই বদলে ঘরটা যেন এই পরিবারের অভ্যাস ও ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। হৈম মুখ তুলে ডাকে, 'এই ঘোঁতনা,' তার পর হাত বাড়ায়। ঘোঁতনকে হৈমর কাছে দিতে শৌরীন্দ্রকে মেঝেতে বসতে হয়। ঘোঁতনকে কোলে নিয়ে হৈম বলে

'এই ঘোঁতনা, ঘোঁতনা, দেখ কী সুন্দর ঘর।'

গভীর ঘুমের ভেতর থেকে ঘোঁতন বিড়বিড় করে, 'মামা যাবে না।'

শৌরীন্দ্র বলে, 'এত সাজালে-গোছালে, দেখলে, হয়ত এলই না।'

'তাতে আমাদের কী এসে যায়। ঘর সাজিয়ে রেখেছি। যে আসবে, তাকেই দোর খুলে দিয়ে বলব, 'কে ভাই, কে ভাই, টুনটনি ভাই, এসো ভাই বসো ভাই, খাট পেতে দি, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?' ঘোঁতনকে বুকে জড়িয়ে একটু দুলে-দুলে ছড়ার মত করে বলছিল হৈম।

ছড়া বলার ছন্দেই সে একবার থেমেছিল, তখন ঘোঁতনের গালে তার গাল লাগানো। কান খাড়া করে। তার পরই শৌরীন্দ্রের দিকে তাকায়। শৌরীন্দ্র সোজা হয়ে বসে শুনতে চেষ্টা করছে। এক দল মানুষের ছুটে আসার আওয়াজ। স্পষ্টই। কিন্তু বোঝা যায় না, সেই বাস রাস্তা থেকে যোধপুর পার্কের ভেতর ঢুকে গিয়েই থেমে যাচ্ছে কিনা। আপাতত এই যোধপুর পার্কটুকুই দ্বীপের মত। সব পক্ষই পালাবার রাস্তা হিসেবে খোলা রাখে। জিরিয়েও যায়। তবু চার পাশের আগুন ত ছিটকে আসেই কিছু।

কিন্তু পায়ের আওয়াজটা ছুটেই আসে। আর ছুটন্ত মানুষের পায়ের আওয়াজের অর্থও স্পষ্ট হয়ে যায়। সবাই মিলে ছুটছে না—একজন পালাচ্ছে, সবাই মিলে তাকে তাড়া করছে। দুটি মাত্র পায়ে পালানোর ছোটার আওয়াজ, পায়ের যূথবদ্ধতা থেকে এমনি ছিটকে যেতে চায়। হৈম-শৌরীন্দ্র বসেই থাকে। আওয়াজটা ছুটে বেরিয়ে যাবে—কখনো-কখনো ত তেমনি হয়। দু-পাশের কংক্রিট-লোহার দেয়ালে-দেয়ালে আওয়াজটা এমন প্রতিধ্বনিত হয় যে তার দিশা হারিয়ে যায়। শৌরীন্দ্র চট করে উঠে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দেয়, দৌড়ে হলের আলোটা নিবিয়ে শোয়ার ঘরের দিকে যেতেই, সমস্ত পাড়াটা দপ করে অন্ধকার হয়ে যায়। এদের বাড়ির একেবারে পাশে প্রায় এই হলঘরেরই দেয়ালে মানুষের ছুটন্ত ক্ষুরহীন আওয়াজের ভেতর শৌরীন্দ্র খুব নিচু গলায় বলে ওঠে, 'তার-কাটিং, না কারেন্ট গেল?'

কথাটা শেষ করে ঘরে ফিরতে পারে না সে। তার আগেই এই ফ্ল্যাটের একমাত্র দরজাটায় ধাক্কা পড়ে, 'দরজাটা খুলুন, দরজাটা খুলুন।' এতগুলো

মানুষের ছোটার সমবেত প্রতিধ্বনির তুলনায় দরজার ধাক্কাটা যেন নেহাতই দুর্বল। 'দরজাটা খুলুন,' 'দরজাটা খুলুন' এই কথাটুকুও একসঙ্গে দমে কুলোয় না, মাঝখানে নিশ্বাস পড়ে যায় আর তাকে ঘিরে ফেলা সেই পায়ের আওয়াজের প্রচণ্ডতার ভেতর নিজেকে লুকোনোর এক মানবিক অভ্যাসেই হয়ত গলার স্বর ছিল, নিচু, প্রায় ফিসফিস, যেন ঐ সমবেত পদধ্বনির, ধাবমান প্রতিধ্বনির ক্রমোচ্চ শ্রুতিপট ছাড়া এ ধ্বনি শোনাত, নিকট, পরিচিত, ঘনিষ্ঠ, গভীর, আস্থাশীল, 'দরজা খুলুন, দরজা খুলুন।'

শৌরীন্দ্র কেমন বিহ্বলের মত, একই স্বরে, উচ্চারণ করে, 'সেই ছেলে এসেছে।' তার কথায় প্রশ্ন, না সন্দেহ, না ঘোষণা, বোঝা যায় না। সে সমবেত পায়ের আওয়াজ একেবারে এই বাড়ির গায়ে হঠাৎ থেমে যায় তার পর এলোমেলো কিছু দ্রুত ছোটা, আর থামা, আর নীরবতা। ঘেঁাতনকে নিয়ে উঠে, দৌড়ে বেরিয়ে, শোয়ার ঘরের দিকে হৈম ঘোরে, ঘেঁাতন চমকে জেগে বিহ্বল তাকায়, 'খুলুন না দরজাটা,' এই কথায় তখন আর কোনো প্রত্যাশা ছিল না, হৈমও ঘেঁাতনকে শৌরীন্দ্রের দিকে বাড়িয়ে দিয়েই ছুটে যায় দরজা। হৈমর বাঁ গোড়ালির মট মট আওয়াজ হয়েই যায়, দরজার নব্ টাতে টান দেয়া ততক্ষণে ঘেঁাতনকে নিয়ে শৌরীন্দ্র তার পেছনে, হৈমর হাত ধরার আর সময় ছিল না, তাকে শুধু একটি জোর ধাক্কায় দরজা থেকে সরিয়ে দেয়া যায়।

'বাবা, মাকে মারছ কেন?' ঘেঁাতন বাবার নাক-মুখের ওপরে চড় মারতে থাকে। বাঁ হাতে ধরা ঘেঁাতনকে একটু সরিয়ে ধরতেই হৈম এক ঝটকায় ফিরে এসে নবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রায়। কিন্তু শৌরীন্দ্র ত তখন সেখানে দাঁড়ানো হৈমর কব্জিটা মুঠোয় চেপে মুচড়ে নামিয়ে এনে মুঠোতেই চেপে থাকে আর হৈম বেঁকে যায়। যূথবদ্ধ ধাবমান পায়ের আওয়াজ এবার যেন একটি মাত্র চিৎকার ফেটে পড়ে, ঘেঁাতন বাবার গলা জড়িয়ে কাঁধে মুখ লুকোয়, আর ঠিক তার পরই, কপাটের ঠিক ওপাশে, একটি বার মাত্র বোমার আওয়াজ প্রতিধ্বনি থেমে যায়। জানলার শার্সিগুলো ঝিনঝিন কেঁপে ওঠে। ঘেঁাতন তার ঐ শরীরকে বাবার শরীরে পিষে ফেলতে চায়। শৌরীন্দ্র গলাটা শক্ত করে। দরজা খাড়া শক্ত দারুণ দাঁড়িয়ে বাইরেটাকে আর ভেতরটাকে সংশয়হীন পৃথক রা

রাখে—হৈমর টানে নবটা সামান্য একটু ঘোরেও নি। খুন থেকে খুনীর প্রস্থান সর্বদাই নিঃসঙ্গ—সমবেত হত্যার পরও। বাইরে কোনো শব্দ ছিল না।

ঘোঁতনের দু-হাতের নখ শৌরীন্দ্রের ঘাড়ের পেছনে বিঁধে আছে, জ্বালা। হাতের মুঠোয় হৈমর মোচড়ানো হাত। হৈম দরজার কাছে মেঝেতে। শৌরীন্দ্র বসে পড়ে। ঘোঁতন তার ঘাড়ের ভেতর মুখ ডুবিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'বাবা, ভারত চলে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আর আওয়াজ নেই ত?'

'না।' মুহূর্তে ওর হাত দুটো আলগা হয়ে যায়। হৈমর হাত ছেড়ে দিলে ওর শরীরটার পাক খোলে। শৌরীন্দ্র হৈমকে কাছে টেনে হাত দিয়ে ঘিরে রাখে।

'বাবা।'

'উঁ।'

'মার লাগে নি ত?' কত গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠে, বোমা, তার মা আর সব কিছু ঘোঁতনকে চেতনায় গেঁথে নিতে হয়েছে।

'না।'

ঘোঁতন যেন ঘুমে নেতিয়ে পড়ে।

আর-একটু পরে, ঘুমের ভেতরই যেমন পাশ ফেরে, তেমনি করে কাঁধ থেকে বুক বেয়ে ঘোঁতনের মাথাটা শৌরীন্দ্রের কোলে নেমে আসে। শৌরীন্দ্র ঘোঁতনকে কোলে শোয়ায়। ঘোঁতন তার এইটুকু দুটো হাত বাড়িয়ে মাকে খোঁজে। কিন্তু ঘুমে চোখ খুলতে পারে না। হৈমর মাথাটা দুই হাতের মুঠোর ভেতর পেয়ে সেই মাথাটাকে ঘোঁতন বুকে টেনে নেয়, তার বুকের তুলনায় ঐ অনেক বড় মাথা-টাকে। তার পর সেই মাথাটাকে দু-হাতের আঁজলায় বুকে জড়িয়ে সে ঘুমিয়ে যায়।

আলো নির্দিষ্ট সময়ে জ্বলেছিল। খুব মৃদু শব্দে ঘরের কোণের ফ্রিজটি এই ঘরে সময়কে আবার চালু করেছিল। নেহাতই মাত্র কয়েকটি মিনিটের অন্ধকার, ছোটাছুটি, বোমা ফাটার পর স্বাভাবিকতায় ফিরে আসতে প্রয়োজনীয় আরও কয়েকটি

মিনিটের নীরবতা দরকার ছিল, আলো জ্বলার আগে। আর, আলো জ্বললে, শোনা গিয়েছিল ছোট জানলার কোনো ছোট ছিটকিনি খোলার আওয়াজ। তার পর, শব্দগুলো টুকরো-টুকরো বাড়ছিল, বড় জানলা, দরজা, জানলার হুক লাগিয়ে দরজার পর্দা সরিয়ে হাট করে দেয়া হচ্ছিল হাওয়া বইবার পথ, কলকাতার বাতাস ত এক এই রাতেই নির্মল বয়। হৈম এখন স্নানঘরে। যে তিনের বিছানা পাতাই ছিল, তাকে শুইয়ে, পাশ ফিরিয়ে শৌরীন্দ্র মশারি গুঁজে দিয়েছে।

হলে বসে-বসে শৌরীন্দ্র বাইরের রিক্সার টুং টাং, গাড়ির হর্ন, রাস্তা দিয়ে যাওয় লোকের কথা, শোনে পাশের বাড়ির গাড়িটা ফিরল। পেছন ফিরে গ্যারাজ করার সময় মুহুর্মুহু গর্জন ওঠে গাড়িটার, কাজের ছেলেটির গলায়, 'ডাইনে ডাইনে'। রেডিয়োতে খবরের চাপা আওয়াজ। সদ্য-সাজানো পাশের ঘরটার দরজার পাল্লা একটু নড়ে, যেন এই মাত্র কেউ ঘরে ঢুকল।

এই ঘরে যার থাকার কথা ছিল এখন সে চৌকাঠে মরে পড়ে আছে। সে যখন এ [illegible] দরজা খোলা যায় নি। শৌরীন্দ্র এখনো দরজা খুলতে পারছে না, এমন কি, একবারটি দেখবার জন্যও না। সে দরজা খুলে মৃতদেহটি দেখলে তাকে থানায় খবর দিতে হয়। কিন্তু থানায় খবর দিলে দলের পক্ষ থেকে আপত্তি উঠবে। থানায় খবর না দিলে পুলিশ তাকে জেরা করতে থাকবে। সে যদি দরজা না খোলে, একেবারেই না খোলে, তা হলে অন্তত বলতে পারবে সে ছোটা ছুটি ও বোমার আওয়াজ শুনেছে কিন্তু তাতে যে কেউ মারা গেছে তা জানত না। তার দরজায় যে কেউ ঘা দিয়েছিল সে কথা ত এখন আর-কোনো তৃতীয় ব্যক্তির জানার কথা নয়—সে আর হৈম ছাড়া। তাদের প্রতিবেশীরা শুনে থাকতে পারে —কিন্তু দরজা-জানলা বন্ধ ঘরে বসে তারা কী করে বুঝবেন দরজাটা এ ফ্ল্যাটেরই? তা ছাড়া, ছেলেটির গলার আওয়াজ ছিল চাপা। ডাকের ভিতর কোনো দম ছিল না। কেউ শোনে নি। ছেলেটি তার কাছে আসতে গিয়ে পুলিশের হাতে বা পাল্টা দলের হাতে পড়ে গেছে। যদি পুলিশের হাতে পড়ে থাকে তা হলে ত পুলিশের জানা হয়ে গেল ছেলেটি তার দরজায় ঘা দিয়েছিল কিন্তু পুলিশ হলে ত অনেক আগেই গুলি ছুঁড়ত। বোমা? পুলিশের কোনো দল হতে পারে। শৌরীন্দ্র কোনোভাবেই তা হলে ঐ ছেলেটির বিষ

কোনো আগ্রহ দেখাতে পারে না। জীবিত যাকে সে দরজা খোলে নি, মৃত তাকে সে মানবে কী করে?

শৌরীন্দ্র এখানে বসে বাইরের আওয়াজগুলো থেকে আন্দাজের চেষ্টা পায় তার চৌকাঠের ওদিকটা কতটা অস্বাভাবিক হয়ে আছে। রিক্সা, গাড়ি ও মানুষজনের চলাচলের আওয়াজ এই কিছুক্ষণ আগের সেই সময়টিকে যেন বহু দূর অতীতে টেনে নিয়ে যায়। রাস্তা দিয়ে যারা যায়, গাড়িতে, রিক্সায় বা হেঁটে, তারা ত কেউই উঁকি মেরে শৌরীন্দ্রের দোরগোড়া দেখে যাচ্ছে না। যার দোরগোড়া সে-ই জানে না সেখানে কী, আর রাস্তার লোক? সেই না-দেখা না-জানাটুকু থেকেই যেন সময় এত তাড়াতাড়ি স্বাভাবিকে ফিরে আসে, এত তাড়াতাড়ি। আজ রাতই হোক আর কাল সকালেই হোক, পুলিশ ত একবার আসবে। তখন শৌরীন্দ্রকে বলতে হবে, যেমন নিশ্চয় এ পাড়ার আর-সবাই বলবে—রাতের খাওয়া-দাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল, ছোটাছুটির আওয়াজ শুনতে পায়, সে ত কখনো-কখনো হয়ই, তার পর বোমা ফাটে। তার পর আর-কিছু হয় নি, তারা খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছিল। হ্যাঁ, আলো নিবে গিয়েছিল একটু সময়ের জন্য।

পুলিশ ছাড়াও শৌরীন্দ্রকে আরেক জায়গায় কৈফিয়ত দিতে হতে পারে। কী ভাবে কী কৈফিয়ত, কিছুই তার জানা নেই। কিন্তু যারা তার কাছে ছেলেটিকে পাঠিয়েছিল, তারা ত জিগগেস করতে পারে। কিন্তু শৌরীন্দ্র ত জানে না, তাকে জানানোও হয় না, কাকে খবর দিতে হবে। যারা শৌরীন্দ্রকে এ-রকম প্রয়োজনে ব্যবহার করবে বলে ঠিক করেছে, তারা নিশ্চয়ই ওটাও ঠিক করেছে যে শৌরীন্দ্রের মতো এত বড় ও ভাল একটা যোগাযোগ যেন কোনো কারণেই প্রকাশ্য হয়ে না পড়ে। তার এই অজ্ঞানতাই এই শ্রেণীযুদ্ধে শৌরীন্দ্রকে এত বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট রেখেছে। একমাত্র শৌরীন্দ্ররাই ত প্রকাশ্যে, এই সমাজের সমস্ত সংগঠন ব্যবহার করে তত্ত্বের প্রচার চালাতে পারে যে শ্রেণীযুদ্ধ মানে শ্রেণীযুদ্ধই, নির্বাচন মানে ভাঁওতাবাজি ও এই শ্রেণীযুদ্ধ ঘটছে ইতিহাসের নির্দিষ্ট স্তরে। এই-সব সরকার-টরকারকে আবার শৌরীন্দ্রদের সুযোগ-সুবিধে দিয়ে যেতে হয়, তার গণতন্ত্রের ছুতো রাখতে। শৌরীন্দ্রর যা জিজ্ঞাসা সবই তাত্ত্বিক, তার সাক্ষ্য ত নিরপেক্ষ তথ্য আর তার সিদ্ধান্ত বড় অর্থে ঐতিহাসিক— খবরের কাগজের ছাপা

নিত্যিকার ইতিহাসের সঙ্গে বা নানা অসংখ্য খুচরো ঘটনার সঙ্গে সেই ইতিহাসের কোনো সম্বন্ধ নেই। শ্রেণী যুদ্ধের দৈনন্দিনতা থেকে এই মুক্তিই তাকে তত্ত্বের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিয়েছে। তত্ত্বের লড়াই ছাড়া ত এই দৈনন্দিনের লড়াই অর্থহীন —কোনটা রাজনীতি আর কোনটা গুণ্ডামি সেটা গুলিয়ে ফেলার মতো অর্থহীন।

যুক্তির একটা কাঠামো পেয়ে গিয়ে শৌরীন্দ্র তার সেই অনায়াস আত্মবিশ্বাসটি ফিরে পায়। এখন সে তার আত্মবিশ্বাসটুকুকে আবার দানা পাকিয়ে তুলতে পারবে। তার ভরসা, বুঝি স্নানে-স্নানে হৈমও দরজার নব-খোলার আবেগের দমক থেকে ছাড়া পেয়ে আসছে। দরজার কাছে ত হৈম ছুটে যেতেই পারে— একটা লোক দরজায় ডাকছে। তার যদি এ বাড়িতে আসার কথা নাও থাকত, তা হলেও হৈম ছুটে যেতে পারত। একবার দরজা খোলার চেষ্টাও করতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয়বারও একই চেষ্টায় যেন আবেগের সেই অতিরেকটা ঘটে! মাত্র একটি শক্ত দরজার সহজ নবই যে বাইরেটাকে ভেতর থেকে আড়াল করে রাখে— এই বিবেচনা সেই মুহূর্তে হৈমর লোপ পায়। কিন্তু এত সহজে যদি লোপ পায় তবে সেই বিবেচনা নিয়ে হৈম সারাদিন বাড়িতে থাকবে কী করে, শুধু ঘোঁতনকে নিয়ে?

কিন্তু শৌরীন্দ্রের অনুপস্থিতিতে হয়ত হৈমই দরজার নবটা আরও ভালো করে এঁটে দেবে। আসল কথা হল, দু-জন থাকলেই এই দুটো কাজের ভেতর দিয়ে যেতে হবে—দরজা খুলতে যাওয়া ও আটকানো। শৌরীন্দ্রই যদি ছেলেটির ডাক শুনে দরজা খুলতে যেত, তা হলে হৈমই তাকে আটকাত, কব্জি মুচড়ে নামিয়ে আনার পুরুষালি ভঙ্গিতে নয়, দু-হাত ছড়িয়ে পথ আটকানোর বা পেছন থেকে জড়িয়ে ধরার সাবেকি মেয়েলি ভঙ্গিতে। কে কী করছে তার সঙ্গতি প্রধান কথা নয়। দুটো কাজই বাস্তব ও সত্য—দরজা খুলতে যাওয়া ও খুলতে না দেয়া। কোনো একটি কাজের ভেতর সঙ্গতি নেই। দুটোকে মিলিয়েই সমগ্রতা। ব্যক্তি এখানে অবান্তর, একেবারেই অবান্তর। এখন, মনুষ্যত্ব এমন-কি নিজের কাছেও প্রমাণ করতে দুজন দরকার হয়। মানুষ আর একা মানুষ থাকতে পারছে না, কলকাতায় অন্তত।

যুক্তির খাঁচাটা সম্পূর্ণ করতে পেরে শৌরীন্দ্রের আত্মবিশ্বাস বেশ শক্ত দানায়

পাকিয়ে যেতে পারে আবার। সেই অফিসে এই ছেলেটির আসার খবর পাওয়ার পর থেকেই ভিতরে-ভিতরে সে খুব এলিয়ে ছিল। রাস্তা থেকে দু-জন দেহাতি মজুরের উচ্চকণ্ঠ আলাপ ভেসে আসে, যেন ওদের দু-জনের ভেতর আলহীন গমক্ষেতের ব্যবধান! এখানে ত নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছেই। তাই দেহাতি মজুরদের স্থায়ী-অস্থায়ী আবাস। এই আলাপ এই রাস্তা ধরে এখন ক্রমেই উচ্চ হবে। তার পর ধীরে-ধীরে নেমে মিলিয়ে যাবে। শৌরীন্দ্র উঠে জানলার পর্দা সরিয়ে প্রথমে, পাশের ছোট জানলার ছিটকিনি খোলে। তার পর, বড় জানলাটাও। চেয়ারে ফিরে আসতে, ঘুরে, শৌরীন্দ্র দেখে, হলের বিপরীত দিকে ঘর থেকে বেরিয়ে হৈম দাঁড়িয়ে। স্নান সেরে পোশাক সম্পূর্ণ পালটে, দাঁড়িয়ে, হৈম কি ভাবছে শৌরীন্দ্র ইতিমধ্যে দরজা খুলেছিল?

কিন্তু হৈমর স্নানের আরামটা যেন সম্পূর্ণ হয় এইখানে দাঁড়িয়, সামনে খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে। ডান হাতের তালু একবার মুখে বুলিয়ে নেয়। গলায় বুকে পাউডারের হালকা প্রলেপ আঙুল দিয়ে একটু লেপে দেয়। মেঝেতে ভেজা পায়ের অস্পষ্ট দাগ এঁকে হৈম পাশের ঘরের নতুন টাঙানো পর্দা, মৃদু সরিয়ে, ভিতরে যায়। তাকে ঘরের ভিতরে আড়ালে রেখে পর্দার তলার কোণাটা মাত্র একটু দোলে।

হৈম, 'খেয়ে নেয়া যাক,' বলে রান্নাঘরের দিকে যায়।

দু মুঠো ভাত মুখে দিয়ে হৈম বলে, 'রেডিওটা ধরো না, এখন ক্লাসিকাল থাকে।'

চেয়ারটা একটু হেলিয়ে, একটু ঘুরে শৌরীন্দ্র রেডিওটা খুলে দিতে পারে। সত্যি, সেতার বাজছে। ডিশে হাতটা একটু থামিয়ে হৈম যেন শোনে। তার পর বলে, 'এমমা।'

'কী হল?'

'তোমার জন্য ও-বেলার একটা চচ্চড়ি ছিল, গরম করতে ভুলে গেলাম, দাঁড়াবে একটু।'

'বাদ দাও, কাল দিও।'

হৈম একটু ভেবে আবার ডিশে হাত চালায়। শৌরীন্দ্রর মনে হয় হৈম বাজনা

শুনছে। কিন্তু হৈম মুখ তুলে বলে, 'এই জন্যেই মা বলতেন প্রথমে পাতে যা দিবি তা নুনের বাটির পাশে রাখবি, আর শেষ পাতে যা দিবি তা জলের কলসীর পাশে রাখবি।'

শৌরীন্দ্র একটু হাসি মিলিয়ে হুঁ' বলে।

হৈম মুখে ভাত দিয়েছিল। শেষ হলে, এক ঢোক জল খেয়ে বলে, 'খুব ত হুঁ দিলে, কেন বলো ত?'

'ঐ ত, ভুল হবে না।'

'ভুল হবে না কেন,' হৈম ডিস থেকে হাত তুলে নিয়েছিল। শৌরীন্দ্র একটু হাসে।

'সত্যি তোমাদের কী বিপদ। কোনো কিছুতে জানি না বলতে পারবে না। হয় কথার মার-প্যাঁচ করবে, নয়ত একটা বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমান হাসি দেবে,' হৈম ডিসে ঘাড় নোয়ায়, হাত দেয় না।

শৌরীন্দ্র বোঝে ব্যাপারটা খুব বিপজ্জনক জায়গায় যাচ্ছে, বিশেষত এখন। সে একটু হেসে বলে, 'আমাদের চাকরিই ত তাই। ডাক্তার কখনো বলে, জানি না? বুঝতে পারছি না? আমরাও সেরকম কখনো বলতে পারি, জানি না? মাস গেলে সরকার এতগুলো করে টাকা দেয়!'

'এই তোমাদের আরেক কায়দা, ধরা পড়লেই স্বীকারোক্তি।'

হৈম ভাত মুখে দেয়। মাথা নিচু করে একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে যায়। খাওয়ার সময় গোলমাল হৈমর স্বভাবের বাইরে। অথচ এখন দু-জনকে ঘিরে এই নীরবতা ক্রমেই অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে। হৈম ঘাড় চেঁছে খোঁপা তুলেছে। সেই খোঁপার মাথা থেকে তার নত মুখের চিবুকের খাঁজ পর্যন্ত একটি সরল রেখা হয়ে যাওয়ায় মুখটাতে কেমন টান আসে। বিশেষত ভুরুর রেখায়। শৌরীন্দ্র বলে, 'কী বাজাচ্ছে?'

একটু চুপ করে থেকে হৈম বলে, 'বুঝতে পারছি না। কানাড়া আছে।' তার পর আবার খেয়ে যায়। দু-জনেই চাইছে নীরবতাটা ভাঙতে, কিন্তু কেউই ভাঙতে পারে না। শৌরীন্দ্র একটু বেশি সতর্ক হয়ে যায়। হৈম একটা কিছু বলুক। অস্বস্তিতে দু-জনেরই খাওয়ার গতি বেড়ে যায়, যেন খাওয়াটা তাড়াতাড়ি

শেষ করাটা খুব দরকার।

হৈম ডিশ থেকে হাত তুলে চেয়ারে হেলান দেয়। হেসে ফেলে। 'আমরা এমন ভাবে খাচ্ছি না, যেন যে আগে খাবে সে প্রাইজ পাবে।'

'তুমিই ত আমার বাড়িয়ে দিলে।'

'তুমি আমার কমিয়ে দিলে না কেন? ভাত নাও,' হৈম এক চামচে ভাত দেয়, নিজেও নেয়।

শৌরীন্দ্র বলে, 'এই একজনের গতিতে আরেকজনের গতি বাড়ায় যা একটা কাণ্ড হয়েছিল না, পুরঞ্জয়ের' হৈম হেসে ফেলে, বেশ ছড়িয়ে, এক পুরঞ্জয়ের নামেই। মজাটা পুরঞ্জয়ের নামে।

'সে আবার কি?'

'তখন পুরঞ্জয় বি-এস-সি পরীক্ষা না দিয়ে তৃতীয়বার বাড়িতে বসে আছে।'

'পুরঞ্জয়দা যেন কেন পরীক্ষা দিতেন না?' হৈম পুরঞ্জয়ের অনেক গল্পই জানে, তাদের চেনাজানা মহলের এক কাহিনীমালার নায়ক পুরঞ্জয়। কিন্তু ঘোঁতন যেমন চেনা গল্পের উত্তেজনাই ফিরে-ফিরে চায়, হৈমও তেমনি এখন পুরঞ্জয়ের চেনা কাহিনীর পরিচিত নাটকে বোধ হয় ত্রাণের আশা পেয়ে যায়। হৈম যখন প্রায় বালিকার মতো শোনা-গল্প শোনার আগ্রহে ব্যগ্র তখন রেডিওতে কানাড়া ধরে একটা মিশ্র রাগ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে।

'পুরঞ্জয়ের বড়দাদার সঙ্গে একটা আদর্শগত মতপার্থক্যের জন্যে পুরঞ্জয় পরীক্ষা দিত না। আর দিলই না। শেষ বাংলা, না কী নিয়ে, যেন বি-এ পরীক্ষা দিয়েছিল।'

'আগে কোনো দিন বাংলা পড়েন নি?'

'ধারে-কাছে না। অঙ্কের অসম্ভব ছাত্র।'

হৈম ধীরে-ধীরে উপকথার কাছে আসে, আমাদের চলতি বাধা-নিষেধগুলো যেখানে অচল।

'এখনো তাই।'

'কি?'

'অঙ্কই সর্বস্ব।'

'তা হলে বাংলা ?

'সেও ত আরেক গল্প।'

'বলো না, বলো না।'

শৌরীন্দ্র তার খাওয়ার গতি কমিয়ে আনে, 'সেটা বুঝি ওর তৃতীয় বৎসরের সত্যাগ্রহ। অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোত। ততদিনে মীরা, ওর পরের বোন, বি-এ পরীক্ষা দিচ্ছে। মীরার বাংলা ছিল। পুরঞ্জয়ের ঘরে বসেই মীরা জোরে-জোরে পড়ত। ওদের ত ফুটবল খেলার মতো ঘর···,'

শৌরীন্দ্রকে থামিয়ে হৈম বলে, 'ব্যাডমিন্টন কোর্টের মতো। ফুটবল খেলার মতো ঘর হয় না। বলো।'

'আচ্ছা। ব্যাডমিন্টন কোর্টের মতো। যা হোক, ঘুমের ভিতর মীরার পড়া শুনে-শুনে পুরঞ্জয়ের বাংলা কোর্সটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।'

'অ্যাঁ ?'

'এ-রকম ওর অনেক কিছুই মুখস্থ হয়ে যেত, লাতিন ব্যাকরণ, অঙ্কের ফর্মুলা, আর সবই ঘুমের মধ্যে। ও বলে, মানুষের মাথাটা ত মৌলিক জৈব কোষ। সব চেয়ে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় তার কার্যক্ষমতা নাকি সব চেয়ে বেশি। মানুষ যত ঘুমোবে তত নাকি ভাবতে পারবে। যা-হোক, ওর বড়দাদা সেবার দেখলেন, ভাইয়ের চাকরির বয়স চলে যাচ্ছে। তাই বড় বৌদিকে বললেন, আমি হার মানলাম, ওকে যা হোক কিছুতে একটা পরীক্ষা দিতে বলো। পুরঞ্জয় ঘুম থেকে উঠল। ওর মাথায় তখন বাংলা ভরা ছিল। গিয়ে বাংলা পরীক্ষা দিয়ে এল। অবশ্য ওদের বাড়িতে তাতেও একটা হুলুস্থুল ব্যাপার।'

'কেন ?' রেডিওর বাজনাটা তখন তানের কায়দায় ঢুকেছে, হৈম বলে, 'বন্ধ করে দাও ত।' কথা বলতে বলতেই রেডিওটা বন্ধ করে দিতে পারে শৌরীন্দ্র। 'তুমি খাও,' হৈম বলে।

'সে বলতে গেলে ত ওদের তিন পুরুষের কথা বলতে হয়। পুরঞ্জয়রা ত কলকাতার আদি ঘটি। পুরঞ্জয় বলে, অন্ধ চার্নকের আগে। গায়ের রং দেখো নি ? মনে হয় গলে যাবে। ওদের কোন বোনকে দেখোনি না ?'

'হ্যাঁ। নীরার বিয়েতে গেলাম না ? পুরঞ্জয়দার ছোটবোন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, নীরার বিয়েতে, দেখেছ, কী চেহারা?'

'রংটা দারুণ, ও-রং আজকাল হয়ই না, কিন্তু ফিগারগুলো—' হৈম তার তন্বী ঘাড়ে আঙুল বুলিয়ে শব্দ খোঁজে, মাথাটা একটু নোয়াতে হয়, খোঁপা-সিঁথি এক সরলরেখায় নমনীয় ঘাড়ে দুলে ওঠে, ঘাড়টা নোয়ানোয় হৈমর ঢিলে জামার বড় গলার ফাঁকে তার বুকের ঢাল আর খাত কিছুক্ষণ শৌরীন্দ্রের সামনে থাকে, 'কেমন লেপাপোঁছা, না?'

'ফিগার? ওরা, ধরো কয়েক শ বছর ধরে রং বানিয়েছে আর শরীরের যততত্র মাংস লাগিয়েছে। ফিগার বানাতে ত আবার কয়েক শ বছর লাগবে', শৌরীন্দ্র আর হৈম একসঙ্গে হেসে ওঠে, 'পুরঞ্জয় বলত, জব চার্নক নাকি ওর তখনকার পূর্বপুরুষের সঙ্গে সকালে নিমগাছের ডাল দিয়ে দাঁতন করতে-করতে গোবিন্দপুরের হোগলাবনে যেত 'টু' করতে, বা তোমাদের আশ্রমের ভাষায়, আত্মার আরামের সন্ধানে। সেখানেই জব চার্নক পুরঞ্জয়ের ঠাকুর্দার বাবার বাবার কাছে হোগলাবনের ফাঁড়িতে উবদো হয়ে বসে জলখরচ করতে শেখেন।'

হাসিতে হৈম এত ছড়িয়ে যায় যে চেয়ারে এলিয়েও নিজেকে আটকাতে পারে না, বাঁ হাতে তার নাক-ঠোঁট আড়াল করেও পারে না, হাসির দমক ঠেকাতে চেয়ারের মাথায় ঘাড় হেলিয়ে দিতে হয়, তাতে হাসিটা হৈমর গলায় আর বুকে দবদব করে। এত হাসি যে হৈমর ভিতরে আছে তা কয়েক মিনিট আগেও বোঝা যায় নি। এত হাসির দমকে-দমকে সারা শরীরের পেশী স্পন্দিত হয়ে ওঠে, সারা শরীরে রক্ত সঞ্চারিত হয়, হৈমর মাথা থেকে পা সব যন্ত্রপাতিই একটা জোর নাড়ায় বেশ তাজা হবে। 'ফ্লাশ', কোনো একটি মার্কিনি পত্রিকায়, মেয়েদের গায়ের চামড়া কী করে টাটকা থাকে, সেই প্রসঙ্গে দেখেছিল শৌরীন্দ্র, উচ্ছ্বসিত হাসি নাকি শরীরের 'ফ্লাশ'। সেইজন্য মাঝে মাঝে খুব জোরে জোরে সারা শরীর কাঁপিয়ে হাসতে হয়—এখন যেমন হৈম হাসছে।

সোজা হয়ে হাসে, বাঁ হাতে আঁচলে চোখ মুছে, পুরো মুখটাই মুছে আঁচলে চোখ ঢেকে হৈম হাসি সামলায়। কিন্তু শৌরীন্দ্রের দিকে তাকাতে পারে না। ডিশের উপর নজর ফেলে রেখে হাসির দমকে মাঝে-মধ্যে কেঁপে ওঠে। শৌরীন্দ্রের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে কোমরটা এলিয়ে এগিয়ে বসে ছিল। 'পুরঞ্জয় বলে,'

শৌরীন্দ্রের কথার শুরুতেই হৈম নতুন হাসির দমকে কেঁপে ওঠে, 'এটাই নাকি ওদের' উন্নতির প্রধান কারণ, চার্নক ও তার পরের সাহেবদের বাঁ হাতের ব্যবহার শেখানো। আমাদের ব্রজকিশোর নাকি ব্রিটিশ মিউজিয়মে চার্নকের একটা নোট আবিষ্কার করেছে,—দি ইউস অব দি লেফ্‌ট হ্যাণ্ড অ্যাণ্ড ইট্‌স এফেক্ট অন ইস্ট ইণ্ডিয়ান ট্রেড।'

'উঃ, আর পারা যায় না,' হৈমকে হাসি সামলাতে টেবিলের সঙ্গে বুক লাগিয়ে সোজা হয়ে বসতে হয়, তার চোখ কুঁচকে যায়, শেষে আর না-পেরে উঠে পড়ে, ডিশদুটো নিয়ে হাসিতে টলতে-টলতে রান্নাঘরে ঢুকে যায়।

দোরগোড়ায় শব নিয়ে ওরা ঘুমুতে গিয়েছিল।

সেই মধ্যরাতে ও তার পরে, বাইরে কোনো নাগরিক শব্দের প্রবাহ ছিল না। শয্যার নিভৃতিতে সে শব্দে বহু গল্প তৈরি হতে পারত। এই এতদিনের বিবাহিত জীবনে কত রহস্যের, কত কেচ্ছার, উপকথা-রূপকথার, সঙ্কেত-ইঙ্গিতের, নীরবতার, হাসির, তারা ভাগীদার। তেমন-তেমন বিপদে-আপদে ত তারা একসঙ্গেই সেই ভাণ্ডারের কোনো সঞ্চয় ব্যবহার করে ফেলতে পারে। এখন, এই মধ্যরাতে ও তার পরে, ত এই শরীর ছাড়া কোনো সঙ্গী নেই, নিশ্বাসপতন ছাড়া কোনো আওয়াজ নেই। ওদের একপাশে ওদের শিশু ছিল—ওদেরই শরীরের ফল। ওদের একপাশে সেই শব ছিল—ওদেরই শরীরের মূল্য। শিশু আর শবের মাঝখানে ওরা ঘুমুতেই ত চেয়েছিল।

শরীর ওদের চেনাই ছিল, দুজনের কাছে দুজনের শরীর বাল্য কাটে যে-পাড়ায় তার রাস্তাঘাট, পথ বেপথ, গলিঘুঁজি, ছায়ারোদ, পুরনো দেয়াল, কোনো-জানলার বাতি, যেমন চেনা থাকে, তখন, ও তার পরে সারাক্ষণ স্মৃতিময় সারা-জীবন। স্মৃতির পথ বেয়েই ত বারবার এই শরীরের আসা ও ফিরে যাওয়া।

শৌরীন্দ্র হৈমর ঘাড়ে হাত দেয়, হৈম বালিশের ভেতর মাথা ডুবিয়ে ঘাড়টাকে টানটান করে, শৌরীন্দ্রের হাতের পাঞ্জায় হৈমর ঘাড় এঁটে যায়, আর শৌরীন্দ্র তার হাতের পুরু তালুর পেষণে চামড়ার তলার কোনো অলস অংশে প্রাণসঞ্চার করতে চায়। বালিশের ভেতর মুখটাকে আরও ডুবিয়ে দিয়ে ঘাড়ের ঢালকে হৈম টান করে। সেই ঢালে শৌরীন্দ্রের হাত পিছলে যায়। অত চুলের আড়ালে হৈমর মাথা আর দেখা যায় না। হৈম যেন মুণ্ডুহীন মৃতদেহ। শৌরীন্দ্র

ঘাড় ঘোরায়।

এখন হৈমর মেরুদণ্ডের খাত বেয়ে শৌরীন্দ্রের আঙুল আর কব্জির চাপ নীচে নামে, ওপরে ওঠে। সেই খাত থেকে হৈমর পেলবতা উছলে যায় পিঠের দুদিকের ঢাল বেয়ে। হৈমর সারাটা পিঠ দুলে ওঠে। হাত দুটো তার মাথার ওপরে জড়ানো বালিশের ওপর দিয়ে অসহায়, যেন সে হাত থেকে মুষ্টি খুলে গেছে। তাই তার পিঠের দু দিকের তেকোণা হাড় দুটো পুরুষালি কাঁপে, পুরুষালি নড়ে। বিস্তারিত চুলে তার মাথা ঢাকা, তার দুই স্তন তার নিজেরই শরীরের আড়ালে—শৌরীন্দ্রের জন্য শুধু খোলা থাকে হৈমর পুরুষতা।

'আ—হ' হৈম তার দুই পায়ের আক্ষেপে আর পিঠের আবর্তনে শৌরীন্দ্রকে সরিয়ে দেয়, তার পর, চিত হয়, দুই হাত দুই পায়ে তার সকল নারীত্ব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে চিত হয়। কোনো অতল জলতলে হৈমর যেন দীর্ঘ নিদ্রা ছিল, প্রবল যুদ্ধের শেষে। এইমাত্র যেন তাকে তুলে আনা—তার দীর্ঘ দীর্ঘ চুল জেলেদের জালের মতো শুকোতে দেয়া, সেখানে শ্যাওলা, শামুক লেগে, সেখানে আঁশটে গন্ধ, সেখানে এখনো মানুষের সবল মুষ্টির চিহ্ন। হৈমর সেই স্তন, একটি পুরুষকেও একটি শিশুকে লালন করে এসেছে, সেই স্তন, এখন বুকময় বুকের ঢালময় ছড়িয়ে, শুকিয়ে, পড়ে থাকে শুধু তার মরচে ধরা বোঁটা, অবান্তর, অবান্তর, খরা-লাগা প্রান্তরের টিউবওয়েলের মুখের মতো অবান্তর। হৈমর বালসন্ধির নরম মাংস দুই হাতে আঁকড়ে শৌরীন্দ্র হৈমর বুকে মুখ গোঁজে—পাথর, পাথর। দুই খাড়া হাড়ে ঘেরা নরম সেই উপত্যকা, তার এক অংশে ত এই শিশুটির বাস ছিল, একদা, শেষ হয়ে যায় এক উষর হাড়ের উচ্চ অভিক্ষেপে তার নীচে, হায়, বীজবহনের কোনো পথ ছিল না, গর্ভমুখী কোনো প্রবাহ ছিল না, শুধু ছিল নিষ্কাশন, মানুষের অন্তর্গত মলমূত্রপচনের নিষ্কাশন। শৌরীন্দ্র দেখে হৈমর কোনো যোনি নেই, যা আছে তা কর্তিত। হায়, হৈম, হৈমন্তী, যাকে দেখে নারীর নাম শঙ্খমালা, নারীর নামে নদীর নাম রাখা, সে এখন একটি ধাড়ি হিজড়ে হয়ে পড়ে থাকে। ওদের সহবাসে শবের অভিশাপ লেগেছে—সৎকার স্থগিত রেখে ওরা সঙ্গমে এসেছিল।

কলিং বেলের আচমকা আওয়াজে হৈম দরজায় আসে। শৌরীন্দ্র অফিস

যাওয়ার আগে বারবার পুলিশের কথা বলে গেছে। ভেবেছিল, আজ ছুটি নেবে। সকালে দরজা খুলে দেখা গেছে, বাইরে মড়া ত দূরের কথা, বোমারও কোনো চিহ্ন নেই। যারা মেরেছিল তারাই হয়ত মৃতদেহটি নিয়ে চলে গেছে। যদি পুলিশ বা পুলিশেরই বানানো কোনো দল ছেলেটিকে এখানে মেরে থাকে, তা হলে তার কাছ থেকে এমন কোনো কাগজপত্র পেতে পারে যাতে শৌরীন্দ্রের হদিশ সম্ভব। তেমন কোনো কাগজ না পেলেও, শৌরীন্দ্রের দোরগোড়ায় মরেছে, একমাত্র এই কারণেই পুলিশ আসতে পারে। আসবেও।

দরজাটা না খুলে খোলা জানলার সামনে গিয়ে হৈম ডাকে, 'কে, আসুন, এদিকে।' দরজার দিক থেকে চটির আওয়াজ পথে নামে, স্যাণ্ডেল, প্যাণ্ট, একটি ছেলে। পোশাক ছাড়াও অবিশ্যি পুলিশ হয়, কিন্তু এ ছেলেটি কখনো পুলিশ হতে পারে না। ছেলেটি জানলার সামনে রাস্তায় দাঁড়ায়, দু-পা এগিয়ে আসতে পারত, এল না। এতটা দূর থেকে জানলা দিয়ে কথা বলতে খারাপ লাগে হৈমর।

'আচ্ছা, এটা ত শৌরীন্দ্রবাবুর বাড়ি?'

'হ্যাঁ।'

'আছেন?'

'না। অফিসে।'

'তা ত বটেই।' ছেলেটি একটু বেশি ঝোঁক দিয়ে, জোরেই, কথা বলে। শেষ কথাটিতে আবার মাথা ঝাঁকায়। চশমার চোখ কেমন গোলগোল—চোখও ও-রকম হতে পারে' পাওয়ারও বেশি হতে পারে। ছেলেটি রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে ঘাড় বেঁকিয়ে।

বাধ্য হয়েই হৈমকে বলতে হয়, 'ওকে কি কিছু বলব?'

'না ঠিক আছে, আমি পরে আসব,' এতক্ষণ দাঁড়িয়ে যেন অন্যায় করেছে, এখন দ্রুত চলে যাবে, এমন ভাবে মাত্র একটি পা ফেলেই ছেলেটি দাঁড়িয়ে যায়, 'উনি কখন ফিরবেন,' ঘাড় বেঁকিয়ে চোখ না তুলে বলল।

'তার ত কোনো ঠিক নেই, নটা-সাড়ে নটাও হতে পারে।'

'অত রাতে ত আমি আসতে পারব না,'

হৈম বুঝল না, তাতে সে কী করতে পারে; 'তা হলে কি কাল সকালে

আসবেন ?' অগত্যা হৈমকে বলতেই হয়।

ছেলেটি এবার হৈমর মুখ পর্যন্ত চোখ তুলে হাসল। হাসিটা এমন যে মনে হয় মুখ ভেঙচাল—চোখ ত গোলই, ফ্যাক করে বড়-বড় দাঁত বের করেই আবার বন্ধ করে দিল, তার পর দু-পা পেছিয়ে বলল, 'কাল সকালে ? আচ্ছা—।' ছেলেটি খুব দ্রুত ডাইনে-বাঁয়ে চোখ বুলিয়ে বাঁয়ে হাঁটে, আবার পেছনে ফিরে রাস্তাটা চকিতে দেখে নেয়।

ঘোঁতন এসে পেছন থেকে টানে, 'মা, মামা এসেছে ?'

হৈম রাত্রির স্মৃতির ওপর চোখ বোঁজে। কিন্তু এই ছেলেটি এখন যে-ভাবে হেঁটে ফিরে যাচ্ছে তাতে ওকে খুব স্বচ্ছন্দ ঠেকে না, বার দুই পেছনে তাকিয়েছে, হৈম কিছু বলবে আশা করে কি ? এই ছেলেটি যদি সেই ছেলেটি হয় ? তা হলে কাল সেই ছেলেটি আসে নি ? যেন বেঁচে যায় এমন ভাবে হৈম ডাকে, 'শুনুন, এই যে শুনুন।' ছেলেটি একটু ঘুরে জিজ্ঞাসু তাকায়। সামনের দোতলার ঝি বারান্দা মুছছিল, সে রেলিঙে ঝুঁকে দেখে, হৈম কাকে ডাকছে। হৈম তখন গ্রিলে মাথা সেঁটে ছেলেটাকে দেখে, ও হৈমই যে ডাকছে এটা বোঝাতে মাথা ঝাঁকায়। ছেলেটি ফিরছে। সামনের বাড়ির দোতলার ঝি ছেলেটিকেও দেখে নেয়, হৈমকেও দেখে নেয়। হৈম তার দিকে তাকানোয় মেয়েটি বসে আবার বারান্দা মুছতে শুরু করে।

ছেলেটি এসে দাঁড়ালেও হৈম কোনো কথা বলতে পারে না। এত দূর থেকে কিছু জিজ্ঞাসাও করা যায় না। আবার, ছেলেটিকে কাছে আসতেও বলা যায় না। পেছন থেকে ঘোঁতন আবার টানে, 'মা, আমাকে জানলায় তুলে দাও, আমি মামাকে ডাকি।' এত ক্ষণে ছেলেটিকেই জিজ্ঞাসা করতে হয়, 'আমাকে ডাকছিলেন ?' হৈম টের পায় সামনের দোতলার মেয়েটি তখনো বারান্দায়। শৌরীন্দ্র বারবার নিষেধ করে গেছে দরজা খুলতে। কিন্তু এ-ছেলেটির সেই ছেলেটি হওয়া হৈমর পক্ষে এত জরুরি যে সে দরজা খোলার ঝুঁকি না নিয়ে পারে না। এক, হতে পারত পুলিশের লোক। কিন্তু এ কখনো পুলিশ হতে পারে না। দোতলার মেয়েটি বারান্দা ছেড়ে নড়ছে না। হৈম বলে, 'ভিতরে আসুন,' জানলার পর্দাটা ফেলে দেয়। ছেলেটির মুখটা যেন উজ্জ্বল হয়। ল্যাচ ঘোরাতে

গিয়ে হৈম বোঝে, কব্জিতে ব্যথা, বুড়ো আঙুলের নীচ থেকে। হৈম দু হাতে কপাট খুলে, দরজায় দাঁড়িয়ে যেন এই প্রথম আবিষ্কার করে দরজা থেকে গেট শাদার ওপর কালো বুটির মোজেইক ধোয়ামোছা, চকচকে; যেন ধুলোবালিও পড়ে নি।

গেটটুকু পার হতেই ছেলেটি এক গাল হেসে দেয়, যেন তাকে আর বেরুতে হবে না। হৈম পাশে দাঁড়িয়ে পথ দেয়। ভেতরে ঢুকে ছেলেটি একটু দ্বিধায় পড়ে স্যাণ্ডেল খুলবে কিনা। দরজা খোলা রেখে হৈম জানলায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ায় মাথায় ওপরের গ্রিল ধরে। ঘোঁতন এতক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ছেলেটির ঘরে ঢোকা, স্যাণ্ডেল খোলা, বসা সব দেখছিল। এখন নজর না-সরিয়ে পায়ে-পায়ে পিছিয়ে মার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। হৈম গ্রিল থেকে হাত নামিয়ে ছেলের মাথায় রাখে। কব্জি ব্যাথা করছিল। ছেলেটি যেন চেয়ারে ঠিক মতো বসতে পারছিল না --একবার পায়ের ওপর পা তুলে হেলান দেয়, তারপর দুই পা নামিয়ে হাতলে হাতদুটি রেখে সোজা হয়। হঠাৎ-ই যেন ঘোঁতনের দিকে নজর পড়ে, আঙুল তুলে ডাকে। ঘোঁতন ঘুরে গিয়ে মায়ের কোলে মুখ লুকোয়। হৈম জিজ্ঞাসা করে, 'ওঁর সঙ্গে আপনার কি বিশেষ কোনো দরকার ছিল?'

'হ্যাঁ, বিশেষই, বিশেষ আর কি,' হৈমর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে-সরিয়ে ছেলেটি জবাব দেয়।

'আপনার নামটা বলবেন?' হৈম শুধোয়।

'বিকাশ,' বলার পর ছেলেটি আরও একবার বলে, 'বিকাশ।'

বিকাশই ত বলেছিল, শৌরীন্দ্র. ছেলেটির নাম? 'আপনার কি আমাদের এখানে—?' থেমে যায় হৈম।

'হ্যাঁ, আমি মানে আমারই, মানে আমাকেই—' ছেলেটি হেসে ফেলে যে হাসি ওর মুখে আলগা লাগে, হৈম জানলা ছেড়ে কালকের সাজানো ঘরটার দরজায় যায়, ঘোঁতন একা পড়ে গিয়ে দু হাত ঠোঁটে তোলে, 'আপনাদের এখানে থাকার কথা। কাল সকালেই চলে যেতে পারি।'

সেই ঘরের দরজার পর্দা ধরে হৈম খুব নিচু গলায়, খুবই নিচু, বলে কাল রাতে আপনার—?'

'না। কাল রাত, বা আজ সকাল, মানে আজ বিকাল বা রাত; মানে আপনাদের এখানেই আসার কথা।' এমনিতেই ছেলেটির কথায় ঝোঁক, তার ওপর হৈম পেছনে, ছেলেটি যেন চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বলে, রাস্তা থেকেও শোনা যাবে।

'কাল সন্ধ্যায় আমরা একটু বাজারে গিয়েছিলাম। রাতে এলেন না দেখে ভয় হল তখন এসে যদি ফিরে গিয়ে থাকেন।'

'না, না, কাল আমি আসি সি, কাল আসি নি।'

হৈম কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছে না কাল রাতে তার দরজায় কে ঘা মেরেছিল দরজা খুলুন, দরজা খুলুন? সেই ছেলেটি নয়, তার জন্য তারা ঘর সাজিয়ে বসে ছিল? সে আবার বলে, 'কাল সন্ধ্যার পর থেকেই এত গোলমাল হল এদিকে।'

'গোলমাল? কেন? কিসের গোলমাল? মানে এদিকে?' ছেলেটি চেয়ারে সোজা হয়ে ঘুরে বসেছে।

'হ্যাঁ, একেবারে আমাদের পাড়ায়, বলতে গেলে আমাদের দরজাতেই কী সব ছোটাছুটি।'

'ছোটাছুটি? কে ছুটছিল?'

'তা কী করে বলব, মনে হল, কেউ কাউকে ধরতে—।'

'ধরতে? সে একা ছিল?'

'কী করে বলব? তার পর ত বোমা মারল।'

'কী বোমা মারল?'

'কী করে বলব?'

'কেন? দেখেন নি? কেন, দরজা খুলে?'

'তাই আমাদের মনে হল, আপনি আবার ঐ গোলমালের ভেতর পড়লেন নাকি।'

'না, আমি ত কাল রাতে আসি নি, কিন্তু এদিকেও কি পুলিশ গোলমাল করছে?'

'সে ত আমি জানি না। তবে কাল সন্ধ্যায় বাজারে গিয়েছিলাম, তখন ত শুনলাম রেললাইনের ওদিকে পুলিশের সঙ্গে নাকি গুলি চলছে।'

'না ওদিক ত মুক্ত অঞ্চল, পুলিশ ঢুকতে পারছে না, আপনাদের এদিকে কী।'

'তা আমি জানি না।'

'না। আপনাদের এদিকটা ত বুর্জুয়া, সেজন্য ত এখানে।'

'অ্যাঁ?' হৈমর গলা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

'হ্যাঁ। সেজন্যই ত এখানে শেল্টার নেই আমরা, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা,' আবার ছেলেটি তার সেই আচমকা হাসি হাসে, 'কিন্তু কাল রাত্রিতে কিসের গোলমাল?'

'আপনি ত আসেন নি, কাল রাতে!'

'না, না, আমি কাল রাতে, না।'

'তা হলে অন্য কোনো গোলমাল হবে—'

এতক্ষণে হৈম যেন সত্যিসত্যি বিশ্বাস করতে পারে, কাল যে-ছেলেটি দরজা খুলতে বলেছিল সে এই ছেলেটি নয়। তাদের বাড়িতে যার আসার কথা ছিল, সে কাল আসে নি, কাল এখানে তাদের বাড়ির সামনে যে-ঘটনা ঘটেছে, তাতে তাদের কিছু করার ছিল না। এই ছেলেটি বিকাশ, বিকাশ—যার আসার খবর দেয়া হয়েছিল শৌরীন্দ্রকে, যার আসার কথা ছিল। বিকাশ। 'এই যে, এই ঘরে আপনি থাকবেন—' হৈমর কথা শেষ হওয়ার আগে বিকাশ তড়াক করে চেয়ার থেকে উঠে পড়ে, ঘরটার দিকে এগিয়ে যায়। ঘোঁতন তার পেছন দিয়ে ছুটে এসে মাকে জড়িয়ে ধরে। মাথাটা তুলে ঘোঁতন মাকে জিজ্ঞাসা করে, 'মা, মামা?'

এক হাতে পর্দা, আরেক হাত ঘোঁতনের মাথায় দিয়ে হৈম বলে, 'হ্যাঁ। মামা।'

বিকাশ ছেলেটি তখন পর্দার সামনে। তাকে ভেতরে ঢুকতে দিতে একটু সরে দাঁড়ায় হৈম, 'ও? আমি মামা?' এই কথাটি হৈমকে জিজ্ঞাসা করা হয়। 'হ্যাঁ, আমি মামা, দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে গল্প হবে,' পর্দা ঠেলে ছেলেটি ভেতরে ঢুকে যায়।

তার পেছনে ঘোঁতন সহ হৈম পর্দাটা সরিয়ে দাঁড়ায়। বিকাশ ভেতরে ঢুকে এদিক-ওদিক তাকায়, তার কাঁধের ঝোলাটা কাঁধ থেকে নামিয়েছিল, কিন্তু কোথায় রাখবে সেটা ঠিক করতে না পেরে আবার কাঁধে তোলে। আবার

এদিক-ওদিক তাকায়। হৈম ওর দেখার ধরনটা বুঝে উঠতে পারে না, যেন হোটেলের ঘর পছন্দ করছে এমনি ওর ঘাড় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে তাকানো আর দেখা। তার পর, 'বা বা, এ ত, তা হলে, আর, না, মানে, কাল রাত্রিতে ত আমি আসি নি,' এ-রকম কতকগুলি কথা বলে যায়। বলে, ডিভানটার ওপর বসে পড়ে। ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে, হৈমর মুখের দিকে তাকিয়ে আবার ওর সেই হাসিটা হাসে, 'হে হে হে হে।' হৈম এতক্ষণ নিজেও উত্তেজিত ছিল। কিন্তু ঘরের ভেতর গিয়ে বিকাশ যখন নিজে থেকেই আবার আগের রাত্রির প্রসঙ্গ তুলল, তখন হৈম চট করে বোঝে, ছেলেটি স্বাভাবিক হতে পারছে না। সে ঘোঁতনকে বলে, "যাও, মামার সঙ্গে গল্প করো," বলে, পর্দা ছেড়ে সদর দরজার দুই কপাটে যখন দুই হাত ছড়িয়ে দাঁড়ায়, তখন, তার সামনে দরজার বাইরের জায়গাটুকুতে আর-কোনো স্মৃতি বা আবিষ্কার নিহিতও নেই—তার বাড়িতে ঢোকার জায়গামাত্রের ওপর হৈম কপাট বন্ধ করল। রান্নাঘরের দিকে যেতে-যেতে শুনতে পায় বিকাশ ঘোঁতনকে ডাকছে, 'শোনো, কাছে এসো, আমি তা হলে মামা, আমি মামা, তোমার নাম কী?"

হৈম চায়ের জল তোলে। ঘোঁতনের স্নান হয় নি, আরেকটা গ্যাসে স্নানের জল তুলতে-তুলতে হৈম ভাবে, ঐ ছেলেটিরও, বিকাশের, স্নানে গরম জল লাগে কিনা জেনে আসতে হয়। সে ওঠে, পর্দা তুলে দেখে মেঝের ওপর ঘোঁতনকে নিয়ে বিকাশ হাত নেড়ে-নেড়ে কিসের গল্প করছে, ঘোঁতন নির্নিমেষ। হৈমকে দেখে গল্প থামিয়ে বিকাশ বলে 'গল্প হচ্ছে। সিংহের।'

'এখন আপনার জিভ খসে যাবে বকবক করতে-করতে, আপনি স্নান করবেন ত?"

কথাটা শুনে বিকাশ যেন চমকে ওঠে, 'তা করতে পারি, হ্যাঁ, স্নান ত সারাই যায়।'

হৈম হেসে ফেলে, 'শোনো, তোমাকে তুমি বলব। এমনিতেও তুমি ছোট। ছাড়া তুমি যখন ঘোঁতনের মামা, তখন ত আমার তুমি বলাই উচিত।'

'মা, মা, তুমি মামাকে তুমি বলো, মা, তুমি বলো,' ঘোঁতন বলে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি কি এতক্ষণ আপনি-আপনি বলছিলেন নাকি?' হৈমর

দিকে মুখ ফিরিয়ে, কিন্তু না-তাকিয়ে বিকাশ জবাব দেয়।

'তোমাকে চা দিচ্ছি বিকাশ।'

'বাঃ, খুব ভাল।'

'নাকি কফি খাবে?'

'কফিও খুব ভাল। খাওয়া যায়।'

'তা হলে কফিই করি, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, করুন।'

ঘেঁাতন বলে, 'মা, আমি কফি খাব।'

'না ঘেঁাতন, তুমি এখন স্নান করবে, ভাত খাবে, এখন কফি খাবে না।'

'মা, আমি কফি খাব, আমি এখন স্নান করব না, মা, আমি কফি খাব।'

'ঘেঁাতন, যা বলব, শুনবে। বিকাশ, তোমার কি স্নানের জন্য গরম জল লাগবে?'

'গরম জল? কেন?'

'স্নানের জন্য'

'আমার?'

'হ্যাঁ। তোমার কি স্নানের জন্য গরম জল লাগবে?'

শুনে বিকাশ অনেকক্ষণ হো-হো হাসে, তার সেই বিদেশী হাসি, হেসেই যায় আর ঘেঁাতন হাসি-হাসি মুখে বিকাশের হাসিটা দেখে যায়।

'আমি ভেবেছি আপনাকে রিপোর্ট দেয়া আছে আমি স্নান করি না, ত আপনি স্নানের কথা বলছেন, আসলে ব্যাপারটা আমাদের সেলেও আলোচ হয়েছে।'

'সেলে? কোন্ ব্যাপার?'

'এই আমার স্নান না-করার ব্যাপারটা, আসলে, আমি একটা যুক্তি দিয়েছিল কিন্তু সেটা কেউ মানল না।'

'কি?'

'না। এখন ত পার্টি ডিসিশন। আমার তখন মনে হয়েছিল বেশি স্ন করাটা বুর্জুয়া ব্যাপার।'

'স্নানও বুর্জোয়া?' মাত্র কয়েকটি মিনিটে এই দ্বিতীয় বার হৈম বুর্জোয়া শব্দটি কাশের কাছ থেকে শুনল।

'না। এই যে বেশি স্নান করাটা—।'

'বেশি কেন, তোমার যেটুকু দরকার সেটুকু করবে!'

'না, এখন মানে, বুর্জোয়ারা সব ব্যাপার থেকে নিজেদের একটু পরিষ্কার দেখাতে না? তাই বলছিলাম। স্নানও যেন একটা স্পেশ্যাল ব্যাপার—।'

'মা, আমি স্নান করব না। মামা স্নান করবে না। আমি স্নান করব না।'

'ও বাবা না, না, তা হলে আমি চান করব, সুন্দর জল আসবে, সুন্দর স্নান , তা হলে তুমি করবে ত?'

'আমার ত গরম জল, তুমি ত গরম জল নেবেই না।'

'না, না, তুমি করলে, আমিও করব।'

'মা, আমি মামার সঙ্গে স্নান করব, মা, আমি মামার সঙ্গে।'

হৈম বেরিয়ে যায়। হৈমর লোভ হচ্ছিল, দু-কাপ কফি নিয়ে গিয়ে ও-ঘরে বসে আড্ডা দেয়। কালকের রাতের ছেলেটি যে বিকাশ নয়, তার জলজ্যান্ত হয়ে বিকাশ ছেলেটি পাশের ঘরটায় বসে-বসে ঘোঁতনকে গল্প শোনাচ্ছে এটা কে এমনি এক স্বস্তি দেয় সে বিকাশের কাছাকাছি থেকে ব্যাপারটির পুরো নিতে চায় যেন। কিন্তু তা হলে আর-সব কাজের দেরি হয়ে যাবে। ছোট হাত দিয়েও হৈম ট্রে-টা নেয় না—বিকাশ আরেক ধরনের অস্বস্তি ভোগ ত পারে। হৈম কাপটা বিকাশের হাতে ধরিয়ে চলে আসে। নিজের টা নিয়ে হৈম খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসে, কফিটা খেয়ে ঘোঁতনকে স্নান য়, বিকাশ আর ঘোঁতনকে খেতে দিতে হবে।

খাওয়ার টেবিলে বসে শুনতে পায় ঘোঁতন বলছে, 'কিন্তু তুমি আমাকেও যুদ্ধে চলো, আমার একটা বন্দুক আছে, বাবা কিনে দিয়েছে।'

বিকাশ বলে, 'তুমি একটু বড় হও, তখন যুদ্ধ করবে।'

এই ত আমি কত বড়, দেখো, দেখো,' ঘোঁতন নিশ্চয়ই উঠে দাঁড়িয়ে সোজা নিজের দৈর্ঘ্য দেখাচ্ছে।

কিন্তু পুলিশরা ত তোমার চেয়েও বড়।'

'হ্যাঁ, পুলিশের গোঁফ থাকে, পুলিশ গাড়ি যেতে দেয় না।'

'পুলিশ গাড়ি যেতে দেয় না, মানে?'

হৈম অনুমান করে ঘোঁতন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বাঁ হাত তুলে ট্রাফিক পুলিস নকল করছে।

হৈম দৌড়ে ঘরে ঢুকে ঘোঁতনকে স্নানে নিয়ে আসে। বিকাশও চমকায় ঘোঁতন কেঁদে ওঠে। হৈম ঘোঁতনকে বুকের ভেতর চেপে ধরে বলে, 'চল স্নান করে নিয়ে তুমি আর মামা একসঙ্গে বসে-বসে খাবে।'

'না, আমি মামার সঙ্গে স্নান করব, আমি মামার সঙ্গে স্নান করব।'

স্নানের ঘরে আলো জ্বালিয়ে হৈম গরম জল নিতে আসে। ঘোঁতন দাঁড়ি দাঁড়িয়ে কাঁদবে কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সাহস নেই।

'এই যে, মানে বলছিলাম,' লবিতে বিকাশের গলা পাওয়া যায়, সেই একটু উ গলায় প্রতিটি শব্দে ঝোঁক দিয়ে-দিয়ে বলা কথা, 'মানে আমিই ওকে স্নান করি দিলে হয় ত।' ঘোঁতন বোধ হয় বিকাশের গলা শুনতে পায়। সে কান্নার জোর বাড়িয়ে দেয়। একটা সসপ্যানে জল গরম করা হয়েছিল। সেটা দুই হাতে ধ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে হৈম দেখে, এই দিকে মুখ করে বিকাশ দাঁড়িয়ে, হৈমকে দে চোখ নিচু করে, কিন্তু মুখের হাসিটির ফাঁক দিয়ে সামনে বড় দাঁত দুটি বেরিয়ে।

'এই-যে এই-যে কী, দিদি বলতে পারো না? আর দিদি বলতে না পার মিসেস চ্যাটার্জি বল,' হৈম শোয়ার ঘরে ঢুকে যায়।

পেছনে শোনে বিকাশ তোতলাচ্ছে, 'না, মানে, সে কি, না না'

হৈমর কথা শুনে ঘোঁতনের কান্না থেমে যায় আচমকা। হৈম কলঘরে বালতি গরম জল ঢেলে, বালতিটা কলের নীচে ঠেলে কল ছেড়ে দেয়। সসপ্যানটা বা রাখে। হৈম যখন শোয়ার ঘর থেকে স্নানঘরে ঢোকার মুখটায় উবু হয়ে ঘোঁতনকে টেনে প্যান্টের বোতামে হাত দেয়, ঘোঁতন কান্নার ভঙ্গিতে বলে, 'প পরে স্নান করব।'

'আচ্ছা, তাই করো, কিন্তু তেল মাখতে হবে ত,' মায়ের হাসি-হাসি কথা ঘোঁতন হেসে ফেলে। কিন্তু তার চোখে তখন জল, নাকে শিকনি। পণ্ডসের কৌটো থেকে অলিভ ওয়েল নিয়ে ছেলেকে মাখাতে শুরু করে।

'মা আমি তোমাকে একটু মাখিয়ে দি।'

'দে।'

ঘোঁতন কৌটো থেকে তেল নিয়ে মা-র মুখে মাখায় আর জিজ্ঞাসা করে, 'মা, মি মামাকে বকলে?'

'হ্যাঁ, বকলামই ত।' বালতি প্রায় ভর-ভর, হৈম হাত দিয়ে জলের উত্তাপ খে কলটা বন্ধ করে দিল।

'কেন বকলে, মামা রাগ করে চলে যাবে।'

'বাঃ আমি মামার চাইতে বড় না? আমি মামাকে বকব না?'

'মামা ত আর থাকবে না?'

'তাতে কী হয়েছে?'

'বাঃ তবে তুমি আমাকে বল কেন, মিসাম্মা ত আর তোমার বাড়িতে থাকবে , তা হলে মিসাম্মাকে কঁদাচ্ছ কেন, বল কেন তা হলে? তুমি? বলো?'

হৈম ঘোঁতনের পায়ের নখে তেল ঘষছিল। সেখান থেকে মুখ তুলে বলে, াঁতাই, তুই বড় হলে উকিল হবি নাকি রে?'

'উকিল কী মা?'

'উকিল মানে যারা কথা বলে।'

'না মা আমি উকিল হব না। আমি যুদ্ধ করব।'

হৈম উঠে ঘোঁতনকে মগটা দিয়ে বলে, 'নে, স্নান কর, আসছি।'

'মা আমি নিজে-নিজে করব।'

'হ্যাঁ নিজে-নিজে করো —' হৈম সসপ্যানটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

কথাটা বিকাশকে ওভাবে বলাটা ঠিক হয় নি, অন্যভাবে বলা উচিত ছিল — ন্তু এমন রাগ চড়ে গেল। বাইরে থেকে হৈম ডাকল, 'কী বিকাশ, নে যাচ্ছ?'

বিকাশ উঠে দরজায় এসে বলল, 'না, স্নানের তেমন কোনো ব্যাপার নেই, তা ড়া,' বলে হে-হে করে হাসতে লাগল।

হৈম বলল, 'তোমার কাঁধে ত একটা ব্যাগ ছিল!'

'হ্যাঁ, আছে ত?'

'তোমার আপত্তি না থাকলে সেটা আমার সামনে এনে একটু ফাঁ
করে দেখাবে ?'

'হ্যাঁ, তাতে কিছু ক্ষতি নেই, কিন্তু, তাতে, ব্যাগ দেখে আপনার, মানে, ক্ষ
নেই কিছু।' বিকাশ ভেতরে গিয়ে ব্যাগটা নিয়ে আসে, তার পর তার সেই হা
হেসে বলে, 'হে-হে-হে হে, মানে, কিছু নেই, কিছু রাখা ত আর, ব্যাগ
একটা, এই আর কি।' পাছে ব্যাগ না খুললে হৈম আবার রেগে যায় তাই বিকা
ব্যাগটা খোলে, কিন্তু দেখতে হলে হৈমকে মুখটা এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

'এদিকে আনো, নইলে দেখব কী করে ?'

'না, দেখার ত, এই যে, মানে, কিছু তেমন নেই।'

হৈম খুব নরম গলায় বলল, 'কিছু মনে করো না, তোমার বোধ হয় একা
তোয়ালে হলে স্নানের সুবিধে হয়, না ?'

'হ্যাঁ। না। স্নানের ত কোনো মানে নেই।'

ঘেঁাতনের গলা শোনা যায়, 'মা, সাবান দিয়ে যাও।'

হৈম বলে, 'দাঁড়াও। বিকাশ, আমি আসছি।'

ও-ঘরে গিয়ে হৈম দেখে ঘেঁাতন দরজায় দাঁড়িয়ে। পাছে গায়ে জল বসে যা
সে সাবান আর স্পঞ্জ নিয়ে ঘেঁাতনের পা হাঁটু, কনুই-এ বেশি করে আর সারা শরী
আলগা ভাবে, সাবান ঘষে দেয়। 'ঘেঁাতন চোখ বন্ধ করো', ঘেঁাতন চোখ ব
করে। তখন ঘেঁাতনের মুখে সাবান ঘষে হৈম বলে, 'ঘেঁাতন, চোখ খুলো
যেন, জ্বলবে, ঘেঁাতন চোখ খুলো না, জ্বলবে।' হাত বাড়িয়ে বালতি থে
এক মগ জল নিয়ে ঘেঁাতনের মুখে ছিটিয়ে সাবান ধুয়ে দেয়। 'ঘেঁাতন চো
খুলো না।' আর-এক মগ জল এনে ঘেঁাতনের মাথায় ঢাললে সাবানটা সম্পূ
ধুয়ে যায়। আরও এক মগ জল ঢালতে-ঢালতে ঘেঁাতন চোখ খুলে ফেলে। খু
ফেলেই ঘেঁাতন মায়ের হাত থেকে মগটা কেড়ে নেয়, 'মা, নিজে-নিজে।'

'ঘেঁাতন আর-বেশি স্নান করবে না, আমি আসছি।'

ওয়াড্রোব খুলে একটা স্নানের তোয়ালে বের করেই বন্ধ করছিল। আবা
খুলে একটা পাজামা বের করে, শৌরীন্দ্রের পাজামা বোধ হয় একটু ছোট হবে
বিকাশ বোধ হয় একটু লম্বা, তা হোক, পরতে পারবে, একটা গুরু পাঞ্জাবি বে

রে—শৌরীন্দ্র বাড়িতে পরে। রান্নাঘরে ঢুকে মিট-সেফ খুলে একটা সাবানের প্যাকেট নিয়ে প্যাকেটটা খুলতে খুলতে বিকাশের ঘরের দিকে যায়। 'বিকাশ,' বাইরে থেকে ডাকে। বিকাশ পর্দা তোলে। হৈম ঘরের ভেতর ঢুকে সেই ঘরের স্নানঘরে সব গুছিয়ে, বেরিয়ে আসে 'যাও, স্নান করে নাও।'

হৈম ভেবেছিল, টেবিলে সাজিয়ে দিলে বিকাশ আর ঘোঁতন খাবে আর সে সেই ফাঁকে স্নান সেরে নেবে। ভাত মেখে দলা পাকিয়ে দিলে ঘোঁতন নিজেই খেতে পারে। অনেকদিন ঘোঁতন খেতে থাকে—সে স্নান সেরে নেয়। কিন্তু তেমনভাবে খেতে হয়ত বিকাশের অসুবিধে হবে, তা ছাড়া মাত্র দু-এক ঘণ্টার ভেতর তাকে একা খেতে বসানোটা অভদ্রতাও। ফলে ঘোঁতনের পাশে সে চেয়ারে বসে, আর সামনে বিকাশের জায়গা।

বিকাশ তার ঘর থেকে বেরিয়ে এগিয়ে আসে। চুলটা পুরো মোছা হয় নি, জুলফি আর ঘাড় দিয়ে জল গড়াচ্ছে। তাতে গুরু-পাঞ্জাবির হাই কলার ভিজে গেছে, আরও ভিজে উঠছে। পাজামাটা ঠিকই হয়েছে। টেবিলের কাছে এসে বিকাশ বুকের ওপর হাত আড়াআড়ি রেখে দাঁড়িয়ে পড়ে, বুকের কিছু যেন সে হাত দিয়ে ঢাকতে চায়। সে চেয়ারে না বসে বলে, 'মানে এই পাঞ্জাবি মানে এটা ত ফিউডাল, এর বদলে আমার হাওয়াই শার্টটা, অবশ্য নোংরা।'

হৈম ঘোঁতনের ভাত মাখছিল, সে শুধু বলতে পারে, 'অ্যাঁ?'

'মানে, এ সব পাঞ্জাবির ভেতর ত একটা অবক্ষয়, মানে ফিউডালিজমের রেমন্যান্ট—।'

হৈম বলে, 'তুমি কি হাত দিয়ে পাঞ্জাবির কাজটা ঢাকছ? তোমাকে ত বেশ লাগছে দেখতে, তুমি ত আর-কোথাও যাচ্ছ না। বাড়িতেই থাকছ। কেউ এলে না হয় হাওয়াই শার্টটা পরে নিও। নাও বোসো।' বিকাশ হাতটা একটু ঢিলে করে কিন্তু নামাতে পারে না।

হৈম বলে, 'বসো, খাবে না?' টেবিলের চেয়ারটা সরিয়ে বসতে বিকাশ বুক থেকে হাতটা নামাতে পারে।

'না মানে আপনি যে আবার এ-সব পাজামা জামাকাপড় সব তা ত হয় না, তাই যদি এমনি সিম্পল, মানে পাঞ্জাবি না হয়ে যে-কোনো জামা হলেই ত হয়।'

ঘেঁাতনের গায়ে জল পড়ায় শরীরটা বোধ হয় নেতিয়ে ছিল, সে ঘুম-ঘুম চোখে বিকাশকে বলে, 'মামা, তুমি এই জামা পরো, বাবা পরে, তুমি পরো, তোমাকে ভাল লাগে।'

হৈম বলল, 'ব্যস, বিকাশ, তোমার আর ত কিছু বলার নেই, ঘেঁাতন বলে দিয়েছে, দাঁড়াও ঘেঁাতনের ভাতটা মেখে নি, তোমাকে দিচ্ছি।'

'না, না, ঘেঁাতন খাওয়ার পর ত আমার সব যুক্তটুক্ত হবে, আপনি যখন থাকে তখনই ত আমি খেতে পারি।'

'তোমরা খেয়ে নাও।'

ঘেঁাতনের ভাত মাখা প্রায় হয়ে গিয়েছিল। দলা পাকাতে-পাকাতে হৈ বলে, 'তুমি ত ভাল করে মাথা মোছো নি, বিকাশ, মাথায় ত জল আছে।'

বিকাশ মাথায় হাত দিয়ে বলে, 'না, ঠিক আছে ত, ও শুকিয়ে যাবে।'

হৈম বলে ওঠে, 'কেন? তোয়ালে ত ছিল, মাথা মোছো নি?'

'না। মুছেছি। মানে। হে হে হে হে। মানে মাথায় ত নোংরা, তোয়ালেট এত শাদা, তাই।'

হৈম খুব লজ্জা পেয়ে যায় হঠাৎ। বলে, 'তা হলে ত মাথায় সাবান দিয়ে নিতে পারতে,' হৈম শ্যাম্পু কথাটা বলে না, 'তোয়ালে ত ধুলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে, তা বলে তুমি ভেজা মাথায় থাকবে!' হৈম চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ায় রান্নাঘরে গিয়ে হাতটা ধুয়ে আসে।

হৈমর একটু লজ্জা করছে। সে ভাবছিল, একটা রাজনীতি থেকেই এই সব জিনিসপত্র ব্যবহারে বিকাশের আপত্তি, সেটা হয়ত ঠিকই, কিন্তু সে আঁচ করতে পারে যে, তাদের পরিবারের এই অভ্যাসেই বিকাশ একটু অস্বস্তি বোধ করতে পারে। তার বাড়িতে এসে কেউ অস্বস্তি পাচ্ছে—এটা হৈমর এত খারাপ লাগে। যদি বিকাশ দু চারদিন থাকে তা হলে সে গামছাই কিনে আনবে ও অন্য কোনো জামা।

হৈম টেবিলে ফিরে গিয়ে বিকাশের সামনে উল্টিয়ে রাখা ডিশটা সোজা করে দেয়। মাঝপথে বিকাশ আবার, 'না, ঠিক আছে আমি, আপনি আবার,' বলে হাত বাড়াতে যায়।

হৈম বিকাশকে ভাত দেয়, তার পর ডালটাও একটা বাটিতে ঢেলে এগিয়ে দেয়, 'তুমি নাও, আমি বসছি।'

'না, না, সেকি, আমি ঠিক আপনি আবার—।'

'দাঁড়াও', বলে উঠে গিয়ে মাখনের প্যাকেটটা আর জলের বোতলটা ফ্রিজ থেকে বের করে। মাখন এক চামচ বিকাশের ডিশে দিতেই সে হে হে করে ওঠে।

'খাও না?'

ঘেঁাতন অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় প্রায়-নিমীলিত চোখে খেয়ে যাচ্ছিল—তার মুখভর্তি ভাত, ঠোঁটের কাছটাও ভেজা-ভেজা। ঘেঁাতন বলে, 'মা।'

'কীরে?'

মুখভর্তি ভাত নিয়ে ঘেঁাতন অস্পষ্ট উচ্চারণ করে বলে 'মামাকে খাইয়ে দাও।'

'শুনছ বিকাশ, ঘেঁাতন কী বলছে?

'কী?'

'তোমাকে খাইয়ে দিতে বলছে।'

বিকাশ ডিশ থেকে হাত তুলে হে-হে হাসি শুরু করে, তার মুখ থেকে দু-একটা ভাত ছিটকে বেরয়, তাড়াতাড়ি মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসিটা বন্ধ করে।

হৈম তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করে, 'পাঞ্জাবিটা যেন কী বিকাশ?'

'না। মানে বলছিলাম, এগুলো ত সব ফিউডাল।'

'ও হ্যাঁ ফিউডাল, তা হলে খাইয়ে দেয়াটা কী? তোমাদের এ-রকম আর কী কী আছে, ফিউডাল, আর-যেন কী।'

'বুর্জুয়া।'

'হ্যাঁ, বুর্জোয়া, আর-যেন কী।'

'ওয়ার্কিং ক্লাশ, প্রলেটারিয়েট।'

'তারা কারা? একটা লঙ্কা নেবে?'

'হ্যাঁ, দিন, ঝাল ত খুব?' হৈম মুনর বাটি থেকে একটা লঙ্কা তুলে দেয়।

লঙ্কায় একটা জোর কামড় দিয়ে বিকাশ জিজ্ঞাসা করে 'আপনি রেগে গিয়েছিলেন এই যে বলি নি মানে—।'

'না, না, রাগি নি, তোমাকে ত বকেই দিলাম—' হৈম ডালের বাটিটা কাত

করে একটু ডাল ঢেলে দিয়ে বলে, 'ডাল দিয়ে মেখে নাও।'

'না, হে-হে-হে।'

এত হাসা সত্ত্বেও বিকাশের হাসিটা তার শরীরের অঙ্গ হয়ে যায় নি কেন। দেখে, ঘোঁতন প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে, হৈম তাঁকে ঝাঁকিয়ে বলে, 'এই ঘোঁতন, ঘুমোস না, খেয়ে নে।'

'মানে, আমরা ত দিদি-বউদি এই-সব ত ফ্যামিলি রিলেশনস, মানে, এই-সব ডাকের ত কোনো বিপ্লবী তাৎপর্য নেই, আমরা সেজন্য কমরেড বলি, কিন্তু আপনি ত কমরেড না, তা, সেইজন্য তখন, আপনি কিছু মনে করবেন না, আর কী যেন মিসেস চ্যাটার্জি ত বুর্জুয়ারা বলে, মানুষের নাম আছে ত, ওরা মানুষকে নাম ধরে ডাকতে চায় না,' এতটা কথা বলতে হওয়ায় বিকাশের খাওয়া থেমে গিয়েছিল, কথাটা শেষ করে সে আবার খেতে শুরু করে।

হৈম গালে হাত দেয়, 'বিকাশ, বাবা-মা, দাদ-দিদি এ-সবও ফিউডাল।'

'মানে ফ্যামিলি ত, কিন্তু ফ্যামিলি মানে, এগুলো ত ফ্যামিলি, সবাইকেই ফ্যামিলির ভেতর ভাবা ফিউডাল শোষণের একটা ট্যাকটিকস ত, তাই, আমরা দাদা-দিদি এই সব বলি না, নাম ধরে ডাকি না, কমরেড বলি।'

'মানে? তুমি আমার এত ছোট, আমায় নাম ধরে ডাকবে?'

'না, এটাও ত ফিউডাল, এই ছোট-বড়।'

'ছোট-বড়ও ফিউডাল? বয়সটাও ফিউডাল? তোমার আগে আমি জন্মেছি এটার মধ্যে ফিউডাল কি?'

'না সে ত ঠিকই; তবে মানে আপনি আগে জন্মাবার জন্যই, কতকগুলি সামাজিক, মানে সমাজের শোষক হওয়ার রাইট হয়ে যাওয়া ত উচিত না।'

'আমি আবার সমাজের শোষক হলাম কিসে?'

'না। সমাজকে যারা বদলাতে চায় না, তারা ত সব চেয়ে বেশি সম্মান টম্মান, এগুলো ত ফিউডাল শোষণের, এই আর কি।'

'দাঁড়াও, আর-একটু ভাত নাও,' দু চামচ ভাত তুলে দিয়ে হৈম বলে, 'এই তরকারি নাও,' হঠাৎ তাকিয়ে দেখে, হৈম বলে ওঠে, 'আরে, এত ঘুমিয়ে পড়ছে, এই ঘোঁতন, এই দুই ফিউডাল নিয়ে আমি করি কী?'

'আপনি ওকে খাইয়ে দিন, আমি ওয়াকিং ক্লাশ হয়ে যাচ্ছি,' বলে বিকাশ ডিশে মাছের ঝোলের বাটিটা উপুড় করে।

'এই ঘোঁতন, ওঠ, এই ঘোঁতন।'

ঘোঁতন চোখটা টেনে তুলে মুখের ভাত একটু চিবোয়। হৈম ঘোঁতনকে কোলে তুলে নিয়ে যায়। আঙুল দিয়ে ওর মুখের ভাতটা বের করে, মুখটা মুছিয়ে, ঘোঁতনকে ঠেলে তুলে এক ঢোঁক জল খাইয়ে হৈম শুইয়ে দিয়ে আসে।

বিকাশ বলে, 'ঘুমিয়ে পড়ল, না-খেয়ে?'

'না, স্নানের পর ঘুম পায় ত, তখন তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিতে হয়। খেয়েছে মোটামুটি, এখন ঘুমোক, তুমি খাও' হৈম এক চামচ ভাত দেয় বিকাশের ডিশে।

'আচ্ছা একটা কথা, মানে আমি ত আপনার ভাই, এই পরিচয়েই যদি এখানে পুলিশ বা কেউ, আমার জেনে রাখা ভাল আপনার ভাইয়ের নাম -।'

'তা হলে ত তোমাকে তখন আমাকে দিদি বলে ডাকতে হবে।'

'না, সে ত মানে রিভলিউশনারি ট্যাকটিক্স। এতেই ত বলতে হতে পারে।'

হৈম বলে, 'শোনো, আমার ভাইয়ের নাম অরিজিৎ, সে বার্ণপুর স্টিল কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার। মনে থাকবে?'

'হ্যাঁ। আপনারা ক-ভাইবোন?'

'আমরা দুজনই— আমি বড়, অরিজিৎ ছোট।'

'কোন্ বছর বি-ই পাশ করেছে?'

'সিক্সটি এইটে।'

'ব্যস, এতেই হবে। বাড়িতে লোকজন এলে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করবেন না, বেশি লুকোচাপা করলেই সকলের সন্দেহ। চেয়ারম্যান বলেছেন, জলের মধ্যে মাছের মত। কাজ না-করে লুকিয়ে থাকার চাইতে জেলখানায় থাকা ভাল। শুধু খোঁচর কেউ এলে জানিয়ে দেবেন।'

হৈম ভুরু পাকিয়ে বলে, 'মানে?'

'মানে, পুলিশের লোক—।'

'ও। আচ্ছা, বিকাশ—।'

'এখন থেকে অরিজিৎই বলুন, নইলে বিকাশ বেরিয়ে যাবে।'

'তোমার নাম বিকাশই ত ?'

'ওটাও ত ছদ্মনাম।'

'তা হলে তোমার নামটা কী।'

'সে ত বলা নিষেধ। আর বলেই বা কী হবে, রিভলিউশনারির কাছে কাজটাই ত আসল। লেনিন, স্তালিন এগুলোও ত সব ছদ্মনাম।'

হৈম লজ্জা পায়। সে বলে বসে, 'দাঁড়াও, তুমি আর-এক চামচ ভাত নাও, আর-একটা মাছ খাও,' উঠে গিয়ে মাছের একটা মাথা নিয়ে আসে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বিকাশ হে হে করে হাসে, 'মাছের মাথা আবার, এত আপনি খাওয়ালেন না, আর—।'

'খাও না, খেয়ে-দেয়ে ঘুমোও একটু।'

'না, সে ত ঠিকই, ঘুমুলে শরীর ঠিক থাকে কিন্তু এত বড় মাথা,' হে-হে করে এমন হাসে বিকাশ, অরিজিৎ, যে, হৈমর সহসা মনে হয় ও মাছের মাথা খেতে ভালবাসে।

'এই, তোমার ত মাছের মাথা খেতে ভাল লাগে ?'

'তা, আপনি জানলেন কী করে ?'

'আমার ভাই অরিজিতের ত মাছের মাথা খেতে ভাল লাগে, বাড়িতে মাছ এলে মাথাটা ওর চাই-ই।'

বিকাশ মুখ তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে বলল, 'আমাদের বাড়িতেও তাই।' তারপর হে-হে করে হাসতে-হাসতে মাছের মাথাটা ভাঙল।

হৈম অনুমান করে তার অনুপস্থিতিতেই বিকাশ ভাল খাবে। সে উঠে বলল, 'বিকাশ, এই বাটিতে একটু চাটনি আছে, নিও, তুমি খাও, আমি স্নানে যাই।'

কিন্তু স্নান করতে ঘরে ঢুকে হৈমর হঠাৎ মনে হল বিকাশকে এ-রকম একা রেখে তার চলে আসাটা ঠিক না। ঠিক এখুনি যদি বাইরের কোনো লোক আসে, বা পুলিশের লোক। বিকাশের খোঁজেই যে আসবে, তা নাও হতে পারে, কালকের ব্যাপারেও ত আসতে পারে। এমনিও পারে। সুতরাং সে তেলের শিশি হাতে আবার খাবার ঘরে ফিরে গেল। কিন্তু খাবার টেবিলে বসে না। বসে গিয়ে দূরে, জানলার কাছে।

হৈম চেয়ারে গা এলিয়ে মাথা হেলিয়ে তার চুল খুলে দেয়। চেয়ারের পিঠে তার মাথা হেলানো থাকে না। মাথাটা বাইরে বেরিয়ে থাকে। সেই লম্বা ঘন চুলের গোছা এতক্ষণের বাঁধাবাঁধির কুঞ্চন, বক্রিমা, আবর্তসহ মাটি আর তার মাথার ভেতর যেন স্থির হয়ে থাকে আর হৈম চুলের ভেতর দিয়ে-দিয়ে আঙুল চালায়। বিকাশ ঘাড় ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কী, স্নানে গেলেন না?' বলে মাছের মাথায় আবার মুখ দেয়।

'এই যাব', হৈম খুব অলস উত্তর দেয়। তারপর চোখটা আধবোজা রেখে ও-রকম এলিয়েই ডাকে, 'আচ্ছা অরিজিৎ।'

'হ্যাঁ বলুন,' বিকাশ চেয়ারে ঘুরে বসে। চিবচ্ছে।

হৈম একগাল হেসে বলে, 'তোমাকে পরীক্ষা করলাম অরিজিৎ বললে জবাব দাও কি না।'

'ও পরীক্ষায় সব সময় ত পাশ। বিপ্লবীদের আসল ব্যাপারটাই হল কোনো সময় প্রস্তুতি নষ্ট না, মানে সব সময় প্রস্তুত থাকা, সব সময়।'

'তা হলে গিয়ে তোমার একটা নাম বিকাশ—যে-নামে আমরা তোমাকে জানি, তার পর আরেকটা নাম অরিজিৎ—যে-নামে অন্যেরা তোমাকে জানবে, তার পরে ধরো, তোমার জন্যে দেখা করতে এসে কেউ ডাকল প্রকাশ, কেউ ডাকল হরিনাথ, কেউ ডাকল ধরো, নীলাদ্রি, তুমি কী করে তখন সবার সঙ্গে কথা বলবে আর সবাই যে তখন তোমার সব নাম জেনে যাবে!'

বিকাশ কথাটার জবাব দেয়ার জন্য চেয়ার ঘুরিয়ে বসে। কিন্তু তার মুখে তখন মাছের মাথার দুর্চব্য কোনো অংশ। ফলে, তাকে ঘাড়টা এক দিকে হেলিয়ে, চোখটা বুঁজে, ঠোঁটটাও একটু বেঁকিয়ে, মুখের ভেতর সেটার ব্যবস্থা করতে হয়। হাতটা তুলে হৈমকে একটু অপেক্ষা করতে বলে। হৈম একটু দেখে চোখ বুঁজে সামান্য একটু হাসে। কথাটা একটু পরে তুললেই হত, বেচারার চিবুনোটা সম্পূর্ণ হবে না।

'দাঁড়ান আসছি',

চেয়ার ঠেলে বিকাশ উঠতেই হৈম বলে, 'চাটনি খেয়েছ?'

বিকাশ দাঁড়িয়ে পড়ে হেসে ফেলে, 'থাক গে।'

'যাও, চেয়ারে বসে খেয়ে নাও,' বলে হৈম চিরুনির গোড়া থেকে কিছু একটা বের করে খুব মন দিয়ে। বিকাশ আবার টেবিলে ফিরে যায়। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই চাটনির বাটির ঢাকা খোলে। দু-চামচ হাতের ওপর ঢেলে নেয়। এতক্ষণে হৈম একটু স্বস্তি পায় --বিকাশ স্বাভাবিক হয়েছে, নিজের স্বভাবগুণেই নিশ্চয়, কিন্তু হৈম তাতে খুশি হয়।

তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে মুখ ধুয়ে বিকাশ পাঞ্জাবিটার ঝুলে হাত মুছতে-মুছতে বেরিয়ে আসে। হৈম হেসেই বলে, 'বিকাশ, গামছা দিয়ে মুখমোছাটা কী, কী যেন, ফিউডাল?'

বিকাশ তাড়াতাড়ি পাঞ্জাবিটা ছেড়ে দিয়ে হেসে বলে, 'তোয়ালেটা বড় শাদা, নোংরা হয়ে যাবে।'

'পাঞ্জাবিটাও ত নোংরা হবে, কিন্তু সেটা ত তোমার গায়ে ঝুলবে।'

'কিন্তু পাঞ্জাবিটা ত আমার গায়ে, একটা যা-হোক করে নেব, কিন্তু দুদিনের জন্য এসে আপনাদের তোয়ালে নোংরা, না ঠিক আছে।'

হৈম বলে, 'তোমার জন্য একটা কালো কুচকুচে তোয়ালে নিয়ে আসব।'

হৈম চেয়ারে সোজা হয়ে বসে তার চুলটা ডান পাশ দিয়ে সামনে টেনে নিয়ে এসেছিল। ফলে তার মুখের ডান দিকটা চুলের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল। আর সেই চুল আঁচড়ানোর জন্য তাকে বাঁ দিকে মুখটা আরও ফেরাতে হয়, ফলে তার মুখের অর্ধেকটা থাকে চুলে ঢাকা আর অর্ধেকটা থাকে ফেরানো। মাথা থেকে চুলের গোড়া পর্যন্ত চিরুনির লম্বা-লম্বা টানে সারাটা চুলে স্রোতের মতো রেখা তৈরি হচ্ছিল।

'আপনারা ত আত্মগোপনের কোনো নীতিই মানছেন না'—বিকাশ সামনের চেয়ারে বসে।

'আমরা ত আর আত্মগোপন করি নি, বেশ প্রকাশ্যই আছি।'

'আহা, আপনাদের কথা না, চেয়ারম্যান বলেছেন আত্মগোপনের অবস্থায় ধরা পড়াটা খুব ভুল। তাতে প্রমাণ হয় ব্যবস্থার কোথাও কোনো মারাত্মক ত্রুটি চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে।'

'আপাতত কী ত্রুটি তোমার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে?'

'এই যে আপনারা বিকাশ-বিকাশ করছেন, বিকাশ ত নাম হতে পারে না, বিকাশ ত শুধু কোড ছিল মিটে গেছে, প্রত্যেকটা জায়গা মানে নতুন পরিচয়। একই নামের হিরো নয়, ও-সব ফিউডাল। কাজটা থাকবে, নামটা থাকবে না। তাই নাম বদলাতে হবে—আমার নাম অরিজিৎ।'

'মানে অরিজিৎটা এখন, কী যেন, ফিউডাল?'

'ধুত।'

'ও সরি, মানে বিকাশটা ফিউডাল আর অরিজিৎটা, কী যেন।'

'প্রলেটারিয়েট বলছেন?'

'হ্যাঁ, মনেও থাকে না, তোমাদের এইগুলো আর-একটু সোজা করা যায় না, যাতে আমাদের মতো লোকদের মনে থাকে।'

'আপনি ঠাট্টা, হ্যাঁ সে আমি ঠিকই, আপনি এস-এমের স্ত্রী আর আপনি, আপনার কাছে, কত শত ইনটেলেকচুয়াল শিখতে আসে?'

'কার স্ত্রী আমি।'

'এস-এম।'

'এস-এম মানে?'

শৌরীন্দ্রের এই নামটা এমন আচমকা শুনে একটু হকচকিয়ে যায় হৈম।

'মানে এস-এম, আমাদের থিয়োরেটিসিয়ান।'

'তোমাদের? মানে?'

'মানে আমাদের, যারা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও চেয়ারম্যানের পথে আমাদের হয় বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি!'

'মানে নকশালেরা?'

'ঐ নাম আমাদের শত্রুরা দিয়েছে, সব দেশেই যেমন। কিন্তু আমরা বুর্জুয়াদের ওয়া সেই নামকে বদলে দিয়েছি।'

'তা হলে তোমাদের নাম এখন কী?'

'না, মানে নামের অর্থ বদলে দিয়েছি, নকশাল।'

'এস-এম তোমাদের নকশালদের কী?'

'মানে, আপনাকে সত্যি কথা কী বলব, আমি, যেদিন খবর হল যে আমাকে

নেকস্‌ট্‌ এস-এমের ওখানে শেলটার, আমি ত প্রায় বিশ্বাস করতে, আমাদের ত ক্লাশ হত এস-এমের লেখা নিয়ে আর সেই এস-এমের বাড়িতে মানে এস-এমকে দেখতে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হল, এ-সব ত এস-এমের জামা ত, পাজামা, মানে ভাবা যায় না', যেন আবেগেই কথা বন্ধ হয়ে এল বিকাশের, সে তার সেই প্রথম হাসি দেখায় হে হে হে হে।

'তোমরা সব জানো নাকি তোমাদের এস-এম কী চাকরি করে, কী পড়াশোনা করে,' হৈম চুলে চিরুনি চালানো বন্ধ করে, সোজা তাকায় বিকাশের দিকে।

'না, ঠিক জানি, মানে এই বুর্জুয়াদেরই খুব বড় চাকরি পড়াশোনা করতে হয়, বুর্জুয়াদের কী সব আছে লাইব্রেরি-টাইব্রেরি, সেখানে, কিন্তু সে ত আমাদেরই রিভলিউশনারি ট্যাককটিকস, হে হে হে হে।'

'কি ট্যাকটিকস ?'

'বুর্জুয়াদের মধ্যে আমাদের লোক ছড়িয়ে রেখে তার পর যখন ঘেরাও হবে তখন আচ্ছা, এস-এম এখন কোথায় ?'

হৈম যেন দুঃখেও হেসে ফেলে, 'সে আমি কী করে বলব, অফিসেই ত থাকার কথা।'

'হ্যাঁ, তা ত হবেই, আসলে ওঁর ত বিপ্লবী তত্ত্বের কাজ, নেতাদের সঙ্গে, সব সময় কিন্তু কী ভাবতে হয়, আচ্ছা উনি কি দিনরাত ভাবেন ?' হৈম অসহায়ের মতো হাসে, 'আর যখন সবাই আসে তখন বোধ হয় সব আলোচনা করে দেন। সব বড় বড় নেতারা, আলোচনা হয়। যদি একটা এ-রকম আলোচনা শুনতে পেতাম না, আপনাকে কী বলব আর, কিছু চাই না। তবে আমি থাকতে থাকতে কি আর সে-রকম আলোচনা হবে ?' বিকাশ আবেগে হৈমর দিকে তাকাতে পারে না, মাঝখানের টেবিলটার দিকে তাকায় আর ওর স্বপ্নের কথা ভেবে আপন মনে শব্দহীন হেসে যায়, হাসির দমকে ওর মাথাটা ঘাড়সুদ্ধ শুধু দোলে আর ওর বড়-বড় দাঁতগুলোর মাথাটুকু শুধু হৈম দেখতে পায়।

হৈম উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়াতে গিয়ে ঘাড়টা পেছনে ঝাঁকায় চুলগুলো সোজা করতে আর ডান হাত দিয়ে চুলগুলোকে পিঠের ওপর টেনে নিয়ে যেতে ওর মাথাটা একটু পেছনে হেলাতে হয়। তার পর ও বিকাশের পাশ দিয়েই বেরিয়ে

—বিকাশ তখনো আপন মনে হেসে চলেছে কোনো-এক অনির্দিষ্ট বাস্তবতা
র আকাঙ্ক্ষার তাড়ায়।

বিকাশের কথায় হৈম তার ঘরের ভেতর মনে-মনে এমন এক অবস্থার সম্মুখীন
সে যাকে তার পরিচিত পরিবেশের অংশ ভাবে নি। চার দিকে খুনোখুনি
, ছুটোছুটি চলে, বোমা বন্দুকও চলে। তার বাড়ির চার পাশেই চলে,
ফেরার আশে-পাশেও চলে, এ-সবের ভেতর দিয়েই ত সবাইকে চলতে হচ্ছে।
কেও। এ-সব নিয়ে তার বাড়িতে কথাবার্তা গল্পসল্পও হয়। কাল শৌরীন্দ্র
া—এভাবেই অবস্থা পালটায়, যদি পালটাতে হয়। আবার এ-ও বলল—তার
চিন্তার কাজ, চিন্তার ওপর ত পুলিশি তদারকি চলে না, মগিং করে ত আর
া আটকানো যাবে না। আর বিকাশের, বা হয়ত কাল যে-ছেলেটি
াছিল, তারও, হাতে-কলমে কাজ। তাই তাদের পুলিশ তাড়া করে।
রীন্দ্রের বাড়িতেই তাদের পালিয়ে থাকতে হয়। এই ধয়েসি একটা ছেলে
স্বাভাবিকতা বিসর্জন দিয়েছে—পাঞ্জাবি পরতে পারে না, তোয়ালেতে মাথা
ত পারে না। এমন-কি, নিজের কোনো নাম স্বীকার করে না। মহান
নেতার মায়ায় যদি এরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে থাকে, যাঁকে এরা চেয়ারম্যান
, শৌরীন্দ্র বা শৌরীন্দ্রের মতো আরও কাউকেও এরা সেই মায়ার ঘোরেই
ছে। শৌরীন্দ্রের স্ত্রী সে, হৈম, তাতে ভয় পেয়ে যায়।

হৈম চমকে জেগে ওঠে। পাশে দেখে ঘোঁতন নেই। উঠে বসেই বিকাশের
মনে পড়ে যায়। সাড়ে চারটা।

বাইরে রান্নাঘরের সামনে এসে শোনে ঘরে বিকাশের গলা—গল্প চলছে।
ই দাঁড়িয়ে থাকতেই ঘোঁতনের গলা শোনা যায়, 'আমি ত বড় হয়ে গেছি,
লেছে ত, আমি ত মিসাম্মার চাইতে বড়, আমাকে নিয়ে চলো না, কী-রকম
করব দেখো।'

'কে কোথায় যুদ্ধ করছে', বলতে-বলতে পর্দা ঠেলে হৈম ঘরে ঢোকে।
ার ওপর বিকাশ আর ঘোঁতন বসে। এক হাঁটু তুলে ঘাড় নুইয়ে বিকাশ
তনের ওপর প্রায় ঝুলে আছে আর ঘোঁতন দুই হাতে মেঝেতে ভর দিয়ে

নিজেকে যতটা সম্ভব সোজা রেখে বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে।

হৈমকে ঢুকতে দেখে বিকাশ বলে, 'এবার কমরেড, মাকে বলে দাও।'

'মা, শোনো', বলে ঘোঁতন ঢোক গেলে। হৈমর দিকে তাকাতে ঘোঁতন ঘাড় ভাঙতে হয়, তাতে, সে যে-ভাবে কথাটা বলতে চায় সেই আবেগটা যে হয় ততটা আসতে চায় না, তাই সে মাকে বলে, 'বসো না।'

হৈম উবু হয়ে বসে পড়ে, 'কী, বল।'

ঘোঁতন পড়া-ভুলে-যাওয়া মুখে বিকাশের দিকে তাকায়, বিকাশ চশমার ভেতর দিয়ে তার গোলচোখ আরও পাকিয়ে বলে, 'বলে দাও কমরেড, মাকে।'

'হ্যাঁ শোনো মা,' ঘোঁতন ঠোঁট টিপে একটু হাসে, পড়া মনে-পড়ার ভঙ্গি 'চার দিকে অত্যাচার, শোষণ, হ্যাঁ, মানুষের কষ্ট, না, মানুষের দুঃখকষ্ট, আ বড়লোকদের আরাম, না?'

বিকাশের দিকে তাকায় ঘোঁতন, 'হ্যাঁ, বলো, ঠিক আছে।'

'এ ত চলতে পারে না।' এর পরের জায়গাটাতে ঘোঁতনের আটকায় আশঙ্কা বোধ হয় কম, তাই দ্রুত বলে ওঠে, 'এ ত চলতে পারে না। তাই, কার আবার বিকাশকে জিজ্ঞাসা করে।

বিকাশও বুঝতে পারে না, 'কী কার?'

ঘোঁতন বিকাশের ওপর বিরক্ত হয়, 'কার কিসে যেন?'

'ও, চেয়ারম্যানের নির্দেশ -।'

ঘোঁতন বিকাশকে থামিয়ে দেয়, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ পারব, পারব, বলতে হবে না, চেয়ারম্যানের নির্দেশে আমাদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, কমরেড।' 'কমরে শব্দটি বলার পর ঘোঁতন মা'র দিকে তাকিয়ে এক গাল হেসে ফেলে, এতটা যে এর পরের কথাটুকু আর শুরু করতে পারে না। নিয়ম অনুযায়ী বাহ্ দো জন্যে মুখ খুলতেই ঘোঁতন হাত উঁচিয়ে থামিয়ে বলে, 'শেষ হয় নি, দাঁড়া চীনের পথই আমাদের পথ।'

হা হা হা হা হাসতে-হাসতে বিকাশ হাততালি দিয়ে যায়। হৈম উঠে দাঁড়া মার দাঁড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে ঘোঁতনের চোখটাও উঠতে থাকে। শেষে মার স ধৈর্য্যে স্থির হয়। মা তবু কিছু বলে না দেখে ঘোঁতন কাঁদো-কাঁদো মুখে ব

লো, কেমন বলেছি, মা।' ঘেঁাতনকে দেখে হৈমর মায়া হয়।
স উৎসাহ দেখিয়ে বলে, 'দারুণ, দারুণ।'
ঘেঁাতন বিকাশকে বলে, 'মামা, মা দারুণ বলেছে,' বলেই আবার মার তাকায়। কোথায় যেন একটা অনিশ্চয়তা ঠেকে ঘেঁাতনের। বিকাশ কবার হে হে হে হে হেসে ওঠে। সেই হাসিতে হৈমর বুক আবার মায়ায় যায়।
রিবেশটাকে হালকা করতে, বেরিয়ে যেতে-যেতে সে বলে, 'এই সব হচ্ছে? র একটা মোটে, একটা মোটে একটা.....,'বলতে-বলতে থেমে যায়, বিকাশও র মার একমাত্র হতে পারে।
ান্নাঘরে যখন চায়ের জল তুলছে, ঘেঁাতন ছুটে এসে পেছন থেকে মাকে জড়িয়ে 'কী রে কী হল?'
ায়ের কাপড়ে মুখ গুঁজে দেয় ঘেঁাতন। জলটা তুলে পেছন ফিরে ঘেঁাতনের বসে হৈম। এখন ঘেঁাতন আর হৈম মাথায়-মাথায়।
া, আমি ত বড় হয়ে গেছি, আমি মামার সঙ্গে যুদ্ধে যাই?'
ল দেখি, মামা কী রকম যুদ্ধে যাচ্ছে,' ঘেঁাতনকে কোলে তুলে হৈম দাঁড়ায়।
আমি বড় হয়ে গেছি আমাকে নামিয়ে দাও, আমাকে নামিয়ে দাও।' হৈম া দেয়। ঘরে ঢোকার আগে ঘেঁাতন হৈমর দিকে মুখ তুলে বলে, 'দুঃখ, মা?' ছলে কোলে না উঠলে মার দুঃখ?'
দুঃখ ত!'
তা হলে দুঃখ।'
কিন্তু আমি যে বড় হয়ে গেছি,' চোখ-মুখ কুঁচকে ঘেঁাতন বলে, যেন মার াকৃতির ওপর তার বড় হওয়া নির্ভর করে।
কী, সব নাকি যুদ্ধে যাওয়া হচ্ছে?' হৈম মেঝেতে বসে।
বলো মামা, বলো মামা, মাকে বলো মামা,' ঘেঁাতনের একটি বিরক্তিকর ন থুতনি ধরে টেনে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বিকাশ তখন হৈমর দিকে তাকিয়েছিল ই ঘেঁাতন তার মুখ ধরে টানাটানি করতে থাকে।
ঘেঁাতন, তোমাকে কতদিন বলেছি এ-রকম মুখ ধরে টানবে না?'

'তা হলে মামা বলছে না কেন,' ঘোঁতন একটু দূরে দাঁড়িয়ে কান্না-ভাঙা বলে।

বিকাশ ঘোঁতনকে কাছে টেনে বলে, 'লংমার্চের গল্প করছিলাম, ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা কী রকম সাহায্য করত মুক্তিফৌজকে।'

'মামা, মাকে বলো আমাদের যুদ্ধে যাওয়ার কথা বলো।'

'বললাম ত।'

'বলো যে তুমি আর আমি যুদ্ধে যাব আর ঠাস-ঠাস করে গুলি করব।'

'গুলি করে কাকে মারবে, ঘোঁতন?'

'যারা দুষ্টু, খুব খারাপ, মানুষকে কষ্ট দেয়!'

'তারপর?'

'তার পর বনের ভেতরে লুকিয়ে থাকব।'

'কার মতো?'

ঘোঁতন কপালে হাত দেয়, থুতনিতে হাত দেয়, তার পর ভুরু কুঁচকে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করে, 'কার মতো মামা?'

'বলো না।'

কার নকলে কে জানে, চিন্তা করার একটা ভঙ্গি আছে ঘোঁতনের, আঙুল ভুরুর মাঝখানে দিয়ে মাথাটা নিচু করে, 'মনে পড়ছে না।'

বিকাশ আর হৈম দু-জনেই একসঙ্গে হেসে ওঠে।

'চে গুয়েভারা।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ মা, চেগুরে, কী মামা?'

'আচ্ছা তুমি শুধু চে-ই বল।'

'চে?'

'হ্যাঁ, শুধু চে।'

'মা, চে-র মতো, চের মতো, মা. যাব ত?'

হৈম বিকাশের দিকে তাকিয়েছিল। ঘোঁতনের কাছে কটা কথা বলে পেরে আর ঘোঁতনকে দিয়ে সেই কথাগুলো বলাতে পেরে বিকাশের যেন ফুর্তি ধরছে না। বিকাশ কি ভুলে গেছে, সে এ-বাড়িতে লুকিয়ে থাকতে এসেছে, তাকে ধরতে পারলে নাকি পুলিশ নিয়ে যাবে। হয় সে কথা ওর মনে নেই

ন হতে পারে, যারা এ-রকম লুকিয়ে থাকে তাদের মনে থাকে না। হেমরও মনে থাকছে না—এ-রকম মনে রাখার তার অভ্যেস নেই বলে? নাকি সেও ল-ভুলে যাচ্ছে, ভুলে-ভুলে থাকছে। হয়ত শৌরীন্দ্র ফিরে আসার পর পারটির গুরুত্ব খুব বেড়ে যাবে। শৌরীন্দ্র, এস-এম, ফেরা পর্যন্ত ব্যাপারটা র, ঘোঁতনের আর বিকাশের ভেতর খানিকটা মজারই ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

কিন্তু ঘোঁতনের সঙ্গে যে-খেলা খেলছে, বিকাশের পক্ষে সেটা ত খেলা —এটা যেমন ঘোঁতন জানে না, তেমনি কি বিকাশও জানে না? তেমনি কি ও জানে না?

বিকাশের আসাট ছিল হৈমর কাছে কালকের রাত থেকে মুক্তি। কিন্তু ত আর বিকাশ জানে না। মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময়ের ভেতর বিকাশই যেন া দাঁড়ায় এই সব কিছুর কেন্দ্র, তার পেছনে পাশে দেখা যায় অজানা পরি-ক্ষিতের কতকগুলি ইঙ্গিত, হৈমর দৈনন্দিনে সেই পরিপ্রেক্ষিত যুক্ত হয়ে যাচ্ছে।

অথচ বিকাশ ত তখন বলল, শৌরীন্দ্রও নাকি বিকাশের বা বিকাশদের মনে ই অজানা পরিপ্রেক্ষিত এনে দিয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিত ত বিকাশের কাছে য়ানা নয়, সে ত যেন হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে। হৈম সেই পাওয়া না-পাওয়ার ানো হিশেব করতে পারে না। তার কাছে প্রধান হয়ে ওঠে ঘোঁতনের সঙ্গে কাশের খেলা আর সেই খেলাতেও বিকাশের আত্মবিশ্বত ফুর্তি। বিকাশ নিজেকে এত ভুলতে পারে বা নিজেকে যে বিকাশের প্রায় মনেই থাকে না, টা হৈমর নতুন কোনো ভূদৃশ্যের মতো, অজানা, অনভ্যস্ত ও নতুন লাগে। কিন্তু পূর্ণ অজানা দৃশ্যও ত মুহূর্তে চেনা হয়ে যায়।

বিকাশ, উঠে দাঁড়িয়ে বলে 'টুক করে একটু গড়িয়াহাট ঘুরে আসি।'

হৈম জিজ্ঞাসা করে 'তুমি গড়িয়াহাট চেন?'

বিকাশ হে হে করে হাসে।

'মানে তুমি কলকাতাতেই থাক!'

বিকাশ হে হে হেসে যায়।

হৈম বলে বসে, 'চলো, আমরাও যাব তোমার সঙ্গে'

'আমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, দুটো-একটা জিনিস কিনব, একটু-আধটু বেড়াব, তার পর চলে আসব

'বেড়াবেন ? মানে আমাকে নিয়ে ?'

'হ্যাঁ, ত কী বলছি তোমাকে ?'

'মানে আমি বেড়াব. মানে, আপনাকে নিয়ে বেড়াব ?'

'বেড়ানোটা কি, কী যেন, বুর্জোয়া ?'

'না, না,' বিকাশ হে হে করে হাসে, 'আমাকে যদি চিনে ফেলে ত, না, বে কী করে। তা ছাড়া আমার ত কাজ আছে।'

'তুমি ত এখানে আমার ভাই হয়ে আছ, নাকি ?'

'হ্যাঁ, তা ত বটেই তা ত।'

'ভাই এলে ত তাকে নিয়ে দোকানপাটে যায়, নাকি ?'

'তা যায় হয়ত।'

'তা হলে নিয়ে চলো আমার সঙ্গে।'

বিকাশ হে হে হে হে করে ঘাড় ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে হাসতেই থাকে, ব্যাপারটার অসম্ভাব্যতা হাসি ছাড়া আর-কিছু দিয়ে সে বোঝাতেই পারছে না

'শোনো, বিকাশ একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেব, হুশ করে চলে যাব, তোমাকে দেখতেই পাবে না।'

'কিন্তু সে, গড়িয়াহাটে কি,' বলে বিকাশ আবারও হাসে।

'আরে তোমাকে ত এই পাজামা আর পাঞ্জাবিতে চেনাই যাচ্ছে না, তে বন্ধুর দেখলেও কি চট করে তোমাকে চিনতে পরেবে ?'

'না। তা অবশ্য না', বলে বিকাশ নিজেকে একবার তাকিয়ে দেখে নেয়।

হৈম বলে, 'তোমার ত আর রেডি হওয়ার কিছু নেই। আমি রেডি আসছি ; একটু দাঁড়াও।'

বিকাশ অসহায়ের মত বাইরে তাকিয়ে বলল, 'একটু সন্ধ্যা হলে—'

'ঐ বেরতে-বেরতেই হয়ে যাবে।'

ঘোঁতন দুধের খালি গ্লাসটা নিয়ে এসে হৈমর সামনে উপুড় করে দেখ সবটুকু খাওয়া হয়ে গেছে। বিকাশের দিকে তাকায়।

'বাঃ বাঃ একেবারে অগস্ত্য মুনি, চল্ চল্, আমরা বেড়াতে যাব—'ঘোঁত

কালে তুলে নিয়ে হৈম ঘরের দিকে ছোটে।

ঘোঁতন কোলের ভেতর থেকে বলে, 'মা, মামার সঙ্গে বেড়াতে যাব, মামা যাবে ত?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ মামা যাবে, দাঁড়া, তুই প্যাণ্টটা খোল।' হৈম ঘোঁতনকে নামিয়ে রেখে আবার বাইরে যায়, 'বিকাশ, শোনো, যদি কোনো ট্যাক্সির হর্ন শোনো, সামনের জানলা দিয়ে ডেকো, দরজা খুলো না, বরং আমাকে ডেকো।'

হৈম আবার ঘরে চলে আসে, বিকাশ গিয়ে জানলার নীচের লম্বা আসনটাতে বসে।

ঘোঁতনের মুখটা একটু কচলে, আঁচলে একটু পাউডার নিয়ে মুখে ঘসে দিয়ে একটা গোলগলা গেঞ্জি পরিয়ে জুতোর ফিতেটা বেঁধে সে ছেড়ে দেয়, 'যা; মামার কাছে গিয়ে বসে থাক, ট্যাক্সি দেখলে ডাকিস।' ঘোঁতন দৌড়ে বাইরে চলে যায়।

জামা-কাপড় বদলাতে হৈম একটু সঙ্কোচে পড়ে, না-জেনে বিকাশকে সে কোনো বিপদের মধ্যে ফেলছে না ত! তার নিজের চলাফেরা বা তার সঙ্গে তাদের ওঠাবসা, শৌরীন্দ্রসহ, তাদের চলাফেরা, ব্যক্তিগত বিপদের আশঙ্কায় বন্ধ হওয়াটা এত অস্বাভাবিক, প্রায় অবাস্তব, যে হৈম ব্যাপারটাকে ধারণার ভেতরই আনতে পারে না। কলকাতার দেয়ালে-দেয়ালে হত্যার কথা চোখে পড়ে, গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও বা মুক্ত এলাকা ইত্যাদি খবরও জানা যায়, কিন্তু দৈনন্দিনের অভ্যাসে তার কোনো প্রভাব নেই। পুলিশ একজন আসামিকে কী ভাবে খোঁজে, কী ভাবে পায় আর বিকাশ ছেলেটি আসামি কী না আসামি হলে কী রকম আসামি, এই সব তার এতই অজানা যে হৈম যেন কিছু কোনো ভাবে আঁচ করতেই পারে না। আর এত সব কিছুর ভেতর হৈম এক বিকেলের জন্যও মেনে নিতে পারে না, যোধপুর পার্ক থেকে গড়িয়াহাট মোড়ে তার যাওয়াটা তার কাছে নিষিদ্ধ হয়ে যেতে পারে। বিকাশের পক্ষে সব চেয়ে খারাপ কী হতে পারে—পুলিশ এসে বিকাশকে ধরল। কিন্তু হৈমর মতো একটি মেয়ের সঙ্গে তার ভাই যাচ্ছে, সঙ্গে ঘোঁতন, পুলিশের পক্ষে কি চট করে এসে ধরা সম্ভব। আর যদি ধরে তবে হৈমকেও ধরবে। গড়িয়াহাট মোড়ে এই বিকেলবেলা বা সন্ধ্যাবেলায় ঘোঁতনসহ হৈমকে পুলিশের ধরাটা এত অসম্ভব ঠেকে হৈমর, যে সে ভেবে নিতে পারে

বিকাশের যে-যে বিপদ হতে পারে, তার আর ঘোঁতনেরও সেই সেই বিপদ হতে পারে। তারা একই বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে—এটাই হৈমকে যুক্তি জোগায়।

'দুটিই অপদার্থ, একটা ট্যাক্সি ধরতে পারে না, আবার যুদ্ধে যাবে!' হৈম দরজা খুলতে-খুলতে বলে। ঘোঁতনের হাত ধরে বিকাশ তার পেছনে-পেছনে বেরয়।

'ট্যাক্সি ত এল না মা, মামা ত দেখল, ট্যাক্সি এল না।'

ওদের বেরতে দিয়ে হৈম দরজাটা বন্ধ করে। যোধপুর পার্কের বিকেল বাড়ি ছায়ায়-ছায়ায় প্রলম্বিত। বিকাশ ঘোঁতনের হাত ধরে পথে নামে। ওর আন দৃষ্টিতে সংশয় আর অনভ্যাস। ওর ভেতর কোথাও একটা কিছু কি ভা লাগে এই বিকেলের, এই অকারণ ঘোরার। সেই ভাল লাগা এই মুহূর্তে বিকাশকে তার বিপদের আশঙ্কার ওপরে নিয়ে যাচ্ছে যেখানে ভাল লাগাটা ভাল লাগা। আর বিকাশের বেলায় ত এটা একটা অতিরিক্ত ব্যাপারও হ পারে, ছুটির মতো, তার উত্তেজনার সহসা অবসানের মতো।

হৈম ইচ্ছে করেই ডাইনে ঘোরে নি। ট্যাক্সি না পাওয়া গেলে তা হলে সে বাস রাস্তা পর্যন্ত যেতে হত। সে বাজারের দিকেই চলছিল। এদিক-ওদি থেকে ট্যাক্সি চলে আসতে পারে। না-এলেও পোস্ট-অফিসের কাছাকাছি পাওয়া যেতে পারে। ট্যাক্সি না পাওয়া গেলে বাস রাস্তা দিয়ে না গিয়ে ও সোজা বাজারের পেছন দিয়ে রেল লাইন পেরিয়ে হাঁটা পথেই পৌঁছে যেতে পারে।

'বিকাশ, অরিজিৎ, কোন্ রাস্তা দিয়ে গেলে তোমার অসুবিধে হবে, বলো।'

'না, না, ঠিক আছে, সোজা গেলেই ত ভাল,' একটু থেমে বিকাশ বলে 'হেঁটে গেলেই ত হয়, আবার ট্যাক্সি খুঁজতে—।'

ট্যাক্সি খোঁজার ব্যাপারটা অনিশ্চিত বলেই নয়, ট্যাক্সিতে ওঠা মানেই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত একটি লোকের হাতে নিজেকে সঁপে রাখা কিছুক্ষণ, এ কথা হৈমরও মনে হতে থাকে। বিকাশ ঘোঁতনের হাত ধরে রেখেছে। কি তার হাঁটায় একটা সতর্কতা থেকেই যায়। হৈম হঠাৎ বলে, 'বিকাশ তোমা সত্যি কোনো অসুবিধে নেই ত?'

'না না চলুন না, হে হে।'

আজ দুপুরের আগে যখন প্রথম তাদের বাড়িতে এল তখন শৌরীন্দ্রবাবু বাড়ি নেই শুনে পথে দাঁড়িয়ে বিকাশ খানিকটা এ-রকমই হেসেছিল। এই হাসি দেখেই হৈমর কেমন মনে হয়েছিল।

'মা, ট্যাক্সি,' ঘোঁতন চিৎকার করে ওঠে।

হৈমর ক্ষণিক ভ্রান্তি হয় বুঝি বিকাশ দৌড়বে, কিন্তু বিকাশ হৈমর দিকেও না-তাকিয়ে ঘোঁতনের আঙুলটা ধরে অন্য দিকে গম্ভীর দাঁড়িয়ে থাকে। ট্যাক্সিঅলা ঘোঁতনের চিৎকার শুনেই তাকিয়েছিল, এবার আঙুলের ইঙ্গিতে জানতে চায় গড়িয়াহাটের দিকে যাবে কিনা। হৈম 'হ্যাঁ' জানিয়ে মাথা হেলানোয় দাঁড়িয়ে পড়ে। রাস্তাটা পেরিয়ে ওদের ট্যাক্সির কাছে যেতে হয়।

কিন্তু ঘোঁতন কিছুতেই জানলা ছাড়া বসবে না। হৈম বুঝতে পারে বিকাশও জানলা ছাড়া বসবে না। হৈম মাঝখানে এসে ঘোঁতনকে আরেকটা জানালা দিলে তাতেও তার আপত্তি, 'মামার কাছে বসব।' সর্দারজি মৃদু হেসে মুখ ঘোরায়, বিকাশ চকিতে মুখ নিচু করে জানলার দিকে ফেরায়।

'ইধার আও বেটা।'

বিকাশ বড় বেশি স্পষ্ট করে ফেলছে নিজেকে লুকনোর চেষ্টা। হৈম ঘোঁতনকে উঁচুতে তুলে সিট পার করে সর্দারজির হাতে দিতে-দিতে একটু দুশ্চিন্তায় পড়ে, ভুলই করল নাকি, সে ত বিকাশের স্বভাব-পরিচয় কিছুই জানে না. কিন্তু বিকাশ যদি আত্মগোপনটাকে এত স্পষ্ট করে তোলে, তা হলে তাতেই ত সবাই ওকে নজর করবে।

সর্দারজি ঘোঁতনকে নিজের পাশে বসিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দেয়। ঘোঁতন বলে, 'এইটা স্টিয়ারিং হুইল?'

'হাঁ হাঁ স্টিয়ারিং হুইল, হা. হা,' সর্দারজি খুব খুশি।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে হৈম বলে, 'এই শুরু হল পণ্ডিতি।'

সর্দারজি তখন ঘোঁতনকে বলছে, 'তুমি স্টিয়ারিং হুইল ধরবে বেটা? ধরো।'

ঘোঁতন চোখটা সর্দারজির মুখের ওপর রেখে ডান হাতটা স্টিয়ারিঙে ছোঁয়ায়।

'এইসা নেহি, এইসা নেহি, হামি যেইসা চালাচ্ছি, তেইসা চালাও, আঁখসে রাস্তা দেখো, দোনো হাতসে চালাও।'

ঘোঁতন সর্দারজির দিকে আরো সরে বিমোহিতের মত দুটি হাত স্টিয়ারিঙে দেয়, কিন্তু এক দিকে। তার ডান হাতটা তুলে সর্দারজি স্টিয়ারিঙের অন্য দিকটা ধরিয়ে দেয়, কিন্তু সেভাবে ধরতে ঘোঁতনকে উঠে দাঁড়াতে হয়। আর উঠে দাঁড়িয়ে সে যখন তার সামনে রাস্তা দেখতে পায় তখন স্টিয়ারিংটাকে সত্যি ঘোরায় আর গাড়িটাও সত্যি ঘোরে, 'মা গাড়ি চালাচ্ছি, মা,' বলে চকিতে একবার পেছনে তাকায়।

সর্দারজি বলে, 'লেকিন আউর এক ড্রাইভার ত ফিন লাগেগা, কিয়া ?' বলে হো হো হাসতে-হাসতে সর্দারজি বাস-রাস্তায় উঠে বাঁ দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে দেয়।

বিকাশ জানলার নীচে মুখটাকে সম্পূর্ণ নামিয়ে এনেছে। ড্রাইভার একটু তাকালেই ব্যাপারটাকে অস্বাভাবিক ভাববে কিন্তু হৈমএখন আস্তে, অথবা ইংরেজিতে, অথবা একটু ধাক্কা দিয়ে বিকাশকে ঠিক হতে বলে কী করে। চকিতে হৈম একবার ভেবে ফেলে ও ট্যাক্সিটা ফিরিয়ে নেবে কিনা, চাকুরিয়ার মোড়ে হঠাৎ ব্রেকে গাড়িটা দাঁড়ায়, বিকাশের চমকটা গাড়ির ব্রেকে ঢাকা পড়ে। হৈম একবার ডাইনে তাকায়—রাস্তাটা নেমে বেঁকে গেছে, বাঁয়ে তাকায়, কাল সন্ধ্যায় কি রেললাইনের এই জায়গাতেই সেই বন্দুকের আর বোমার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। শেকলে বাধা রিভলবার নিয়ে ট্রাফিক পুলিশ ড্রামে, তার তিন পাশে তিনজন পুলিশ রাইফেলসহ, প্রত্যেকেরই রাইফেল শেকলে বাঁধা। গাড়িটা আবার চলতে শুরু করলে হৈম দেখে ফেলে, বাঁ-হাতি কোণে একটা খোলা জিপভর্তি মিলিটারি-সবুজ লোহার টুপি আর বেয়নেট-হীন রাইফেলের ভোঁতা সারি; মাউথপিস মুখে, পোশাকের রঙে আর হেলমেটহীনতায় কোনো অফিসারই হয়ত, অয়্যারলেসে কিছু বলে যেতে রাস্তার সামনে তাকিয়ে। বিকাল প্রায় হাঁটুতে মাথা গুঁজে না থাকলে, বিকাশই তার দৃষ্টিপাতে শুধু থাকত। হৈম পরিষ্কার বুঝতে পারে, তার যেন শীত লেগে যাচ্ছে। এ দৃশ্যের সঙ্গে হৈমর ত কোনোদিন কোনো যোগ নেই। আজ বিকাশের সঙ্গে বেরিয়েই কি এই সমস্ত দৃশ্য অত্যন্ত দরকারি হয়ে ওঠে আর হৈমর পক্ষে হয়ে ওঠে এতটাই প্রাসঙ্গিক! গোলপার্ক পেরিয়ে ট্যাক্সি গড়িয়াহাটের মোড়ের দিকে এগতেই হৈম বলে, 'দাঁড়ান।'

সামনের দরজাটা খুলে ঘোঁতনকে নামিয়ে দিতে-দিতে সর্দারজি বলে, 'আউর

এক রোজ হোগা ড্রাইভিং, বেটা !'

হৈম ভুলেই গিয়েছিল, সে কেন বেরিয়েছে। গড়িয়াহাটে এত মানুষজনের ভিড়ে সে যেন খানিকটা স্বাভাবিক হতে পারে। এত মানুষের চলাফেরা কেনাবেচা হাসাহাসিতে ঢাকুরিয়ার মোড়ের অন্ধকারলেস ভ্যানটাকে অনেক দূরের ব্যাপার মনে হতে থাকে। ঘেঁাতন বিকাশের হাত ধরে ছিল।

বিকাশ হৈমর পাশে এসে বলে, 'আপনি ওর একটা হাত ধরে থাকুন।'

ঘেঁাতনের আরেকটা হাত ধরতে-ধরতে হৈম বলে, 'কেন? থাক না তোমার কাছে।'

'আমিও ধরে আছি, কিন্তু হঠাতের কথা ত বলা যায় না।'

'ও', হৈমকে নিমেষে বুঝে ফেলতে হয়।

হৈমর খুব তেষ্টা পেয়েছিল, সে একটা কিছু খুঁজছে। 'দেখি তিনটে,' হৈম ব্যাগ থেকে পয়সা বের করে।

বিকাশ কাছে এসে বলে, 'কী?'

'খাও না।'

'কী?'

ততক্ষণে তিন বোতল এসে গেছে। ঘেঁাতন 'আমাকে দাও, আমাকে দাও' করে হাত বাড়িয়ে, নিয়েছে। হৈম স্ট্র মুখে দিয়েছে। সুতরাং অগত্যা বিকাশও।

খেতে-খেতে হৈম বিকাশকে ডাকে, 'বিকাশ, শোনো।' বিকাশ আর-একটু কাছে আসে।

'তোমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না ত, তা হলে চলো ফিরে যাই।'

বিকাশ একবার স্ট্র মুখেই চোখ বুলিয়ে নেয়, 'ঠিক আছে, দেখা যাক না।'

একটু পরে বলে, 'আপনি ঘেঁাতনের হাত ধরে থাকবেন। যদি দেখেন আমি আপনাদের সঙ্গে নেই, তা হলে বুঝবেন কেটে পড়েছি, ভাববেন না।'

'তেমন হলে, তুমি এখান থেকে বাড়ি চলে যাবে ত?'

স্ট্র থেকে মুখ সরিয়ে বিকাশ বলে, 'সে দেখা যাবে।'

'না, না, তা হলে বরং চলো, এখুনি ফিরি।'

'বলছি ত তার দরকার নেই।' স্ট্র-তে ঠোঁট ডুবিয়ে বিকাশ একটু সরে যায়।

বিকাশের সঙ্গে একটু কথা বলে, চার পাশে লোকজন দোকানপাতির ভিড় দেখে, হৈম একটু স্বাভাবিক হতে থাকে। পানীয় খেতে খেতে সে এদিক-ওদিক চাইছিল। পাশেই একটা জুতোর দোকান। দু-পা সরে সেই দোকানটার সামনে গিয়ে হৈম একটু নিচু হয়ে কিছু দেখে, তার পর আঙুল নিয়ে উঁ উঁ করে দোকানিকে দেখাতে বলে। দোকানি এক জোড়ায় হাত দেয়। হৈম হুঁ-হুঁ করে ওঠে। দোকানি তার পাশেরটাতে হাত দেয়, হৈম একটা লম্বা হুঁ দিয়ে সম্মতি জানায়। ডান হাতে বোতল ধরা, বাঁ হাতে রুমাল। বাঁ হাতেই হৈম স্যাণ্ডেলটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। 'দেব ?' হৈম স্যাণ্ডেলটা রেখে দিয়ে ফিরে আসে। বিকাশের বোতল নামিয়ে-রাখা। 'ঘোঁতন, তোর হল ?' পেছন ফিরে হৈম দেখে বিকাশ একটু এগিয়ে, দাঁড়িয়ে।

ওদের এগোতে অসুবিধে হয়, যেমন হওয়ারই কথা প্রায়-সন্ধ্যার গড়িয়াহাটায়। ফুটপাথের দুদিকেই দোকান—বাঁয়ে পাকা দোকান, ডাইনে গুমটিঘরের দোকান। সেই গুমটিঘরের সারিতে রাস্তাটা আড়াল পড়ে। বাস, ট্রাম, গাড়ির আওয়াজ আসে, হর্ন বাজে, ট্রাফিক আলোর রঙ বদলায়, সে বদলে গড়িয়াহাটের আকাশজোড়া আলোর বিস্তারের রঙ খুব পাতলা বদলায়, সে বদলে মানুষজনের যে ভিড়টা মোড়ের কাছাকাছি তাদেরও রঙ আরও পাতলা বদলায়। ফুটপাথ দিয়ে যারা চলছে, তাদের তাড়া নেই, যেন কোনো বড় খোলা একজিবিশনে সবাই ঘুরে ঘুরে দেখছে।

সেই প্রায়-অচল অথচ ঘুরন্ত-নড়ন্ত ভিড়টা বিকাশকে ধরে ফেলে। দিনের আলো নেই। দোকানপাট, রাস্তাঘাটের আলো জ্বলে গেছে তাতেও হয়ত বিকাশ কিছুটা স্বস্তি পায়। কিন্তু ঐ ভিড়টা যেন তাকে বর্মের মতোই ঘেরে। বিকাশের অসুবিধে, তার খানিকটা দৈর্ঘ্য একটু হেঁট হয়ে চলতে হচ্ছে ওকে, দাঁড়াতে হচ্ছে। হৈম একটা খোঁপার দোকানে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘোঁতন পেছন ফিরে বিকাশকে দেখে মায়ের হাত ছেড়ে এসে বিকাশের হাত ধরে। হৈম ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নেয়।

ঘোঁতনকে নিয়ে পায়ে-পায়ে বিকাশ সেই খোঁপার দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। এসে দেখে, ভেতরে বেণীও আছে। যেন, মেয়েদের মাথার আস্ত

চুল তুলে নিয়ে এখানে সাজিয়ে রাখা। এত সাজানো-গোছানো বেণী আর খোঁপা দেখলেই চামড়া-ছুলে-নেয়া পাঁঠার মতো কোনো মানুষের শরীর মনে আসে। হৈম একটা খোঁপা হাতে করে দেখছিল।

দোকানি বলল, 'এটাও নিতে পারেন', আর-এক-ধরনের খোঁপা হৈমর হাতে দেয়।

পাশে বিকাশকে টের পেয়ে হৈম জিজ্ঞাসা করে, 'কী, কোনটা নেব, বল।'

'আপনি খোঁপা কিনবেন নাকি?'

'কত ভিজাইন, দেখছ না!' হাতের খোঁপা দুটো রেখে দিয়ে হৈম চোখ সরিয়ে নেয়। দোকান থেকে সরে আসে।

'কী কিনবেন, কিনুন না, শুধু ত দেখছেন।'

'তুমি একটা বোকা, এটা কি রেশনের দোকান যে লোকে রেশন তুলতে আসবে? এখানে সবাই দেখতে আর দেখাতে আসে।'

'তা হলে এত দোকান!'

'কেনেও। আমরাও কিনব।'

'দেখো, দেখো, বিকাশ,' হৈম বিকাশকে আস্তে ডাকে। বিকাশ একটু নিচু হয়। 'পাশের স্যাণ্ডেলের দোকানটায় দেখো।'

বিকাশ তাকিয়ে দেখে একটি মেয়ে স্যাণ্ডেল পরছে। 'কী?'

হৈম বলে, 'দেখছ না, মেয়েটার পা কী-রকম ফিডাল,' তারপর যখন তাকায় তখন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই মেয়েটি নিচু হয়ে পায়ের স্যাণ্ডেলে আঙুল লাগিয়ে কিছু দেখছে, জামার ফাঁক দিয়ে তার বুকের অনেকটা দেখা যায়, হৈম তাড়াতাড়ি চোখ ঘুরিয়ে নেয়।

'কী, কী', বিকাশ জিজ্ঞাসা করে যায়।

হৈম দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, 'বাদ দাও, বুর্জোয়া হয়ে গেছে।'

ওদের ডাইনে কয়েকটা গায়ে গা-লাগানো দোকানে মাটির নানা জিনিশ, অ্যাশ-ট্রে, ফুলদানি, আরও নানা রকম কিছু, পাশে প্লাস্টিকের ফুল—রজনীগন্ধা, বাগানে যে-সব ফুল ফোটে তেমনি কিছু, গানের রেকর্ড দুমড়ে-মুচড়ে নানা ডিজাইন, টেবিল-ক্লথ গোছের কিছু, আবার প্লাস্টিকের নানা জিনিশ। বাঁয়ে একটা

গলিমতো। তার মুখের দোকানটাতে হৈম যায়। ঘোঁতন তখন বিকাশের কোলে। দোকানটায় গিয়ে দাঁড়াতেই বিকাশ দেখে, শো-কেসে একটি বিপুল মেয়ের কালো শরীরে শুধু ব্রা আর ব্রিফের শাদা, মেয়েটি যেন ফেটে যাবে। বিকাশ পেছন ফেরে।

ঘোঁতন বলে ওঠে, 'মামা, দেখো দেখো, এত বড় মেয়ে ন্যাংটো।'

বিকাশ ছিটকে উল্টো দিকের দোকানের সামনে যায়, 'ঘোঁতন, ঘোঁতন, এইটা নাও।' হাতের কাছে যেটা পায়, সেটাই ঘোঁতনের হাতে তুলে দেয়।

বিকাশের কোলে সেইটি নাড়তে-নাড়তে ঘোঁতন বলে, 'এটা ত খুন্তি, মা রাঁধে।'

'তা হলে আ -কিছু নাও', বিকাশ খুন্তিটা নামিয়ে রাখে। তার পর একটু সরে দাঁড়ায়। কিন্তু ঘোঁতনের কথা কেউ শোনে নি, ভিড়টা এমনই থাকে।

হৈম দোকান থেকে এসে বলে, 'চলো, একটা কিছু খেয়ে নিয়ে, দু-একটা জিনিশ কিনে, ফিরব। তুমি তোমার কাজে যাও।'

'আবার খাওয়া-টাওয়ার দরকার কী?' ঘোঁতনকে কোলে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বিকাশ বলে।

'ওকে নামিয়ে দাও না। ঘোঁতন, হেঁটে চল্। বলো না, কেমন লাগছে তোমার, ভাল না?'

'না আমি নামব না। হাঁটব না।'

'কেন রে।'

'ধাক্কা লাগে, হাঁটতে পারি না।'

'ওব্ বাবা তবে না তুই বড় হয়েছিস? দাও বিকাশ, ওকে আমার কোলে দাও।'

'না, ঠিক আছে। এত বিকাশ-বিকাশ করবেন না। অরিজিৎ বলুন।'

'ওঃ, সরি।'

'কেন মামা,' ঘোঁতন বিকাশের থুতনি ধরে মুখ ঘোরায়, 'তোমার নাম বিকাশ না?'

'আমার অনেক নাম, তোমাকে পরে বলব।'

ওরা খাবার দোকানটায় পৌঁছে যায়। ঝকঝকে কাচের দরজায়, ইংরেজিতে কোনো অনুষ্ঠানের পোস্টার। সেখানে কেউ নাচবে। বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছে একটু চাপা আলোতে সবাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খাচ্ছে। হৈমর দ্বিতীয় পা যখন নীচের সিঁড়িতে, বিকাশ কাছে গিয়ে বলে, 'আপনি ঘোঁতনকে নিয়ে যান, আমি বাইরে আছি।'

'সে কী? তুমি যাবে না?'

হৈমকে একটু সরে গিয়ে পথ ছাড়তে হয়। মাঝবয়েসি ভদ্রলোক মাথা ঘুরিয়ে বিকাশকে দেখেন। বিকাশ তাকিয়ে থাকে। ভদ্রলোক, হৈমর পাশ দিয়ে উঠে, কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে, ঘুরে, কাচের ওপার থেকেও বিকাশের দিকে তাকান, সামনে হৈম থাকা সত্ত্বেও। মোটাসোটা, লম্বা ভদ্রলোকের হাঁটা-চলাই যেন একটু অগোছালো। তিনি ততক্ষণে কাউন্টারের কাছে পৌঁছে গেছেন— সবার পেছনে। সাধারণত এ বয়সের ভদ্রলোক একা-একা এমন শপের রেস্তরাঁয় ঢুকে খান না। বিকাশের চোখ দেখে হৈমও ভদ্রলোকের দিকে তাকায়। কাউন্টারের সামনে থেকেও ভদ্রলোক একবার বাঁ দিকে দেখলেন, যারা দাঁড়িয়ে খাচ্ছে তাদের, তার পর ডাইনে দেখলেন, যারা দাঁড়িয়ে খাচ্ছে তাদের, যতখানি ঘুরলে বিকাশকে দেখা যায় প্রায় ততখানি না-ঘুরে আবার সোজা কাউন্টারের দিকে ঘোরেন। খাওয়াটা যেন ভদ্রলোকের প্রধান ব্যাপার নয়। বিকাশ হৈমকে বলল, 'চলুন।' হৈম বিকাশের দিকে জিজ্ঞাসু তাকায়, বিকাশ হাসে, মলিন ও উদ্বিগ্ন। ঘোঁতনের হাত ধরে বিকাশই আগে ঢুকল।

আর ঘোঁতন প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'মামা, আমাকে কাঁধে তোলো, কোনো খাবার দেখতে পাচ্ছি না।'

কেউ-কেউ হেসে ওঠে। অনেকে ঘুরে তাকায়। সেই ভদ্রলোকও। বিকাশ সেই ভদ্রলোকের মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে বলে, 'বদনাম করে দিল।'

ভদ্রলোক হাসলেন কিনা বোঝা গেল না, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে বাইরে তাকান। খাবার তাগিদ ওঁর খুব একটা নাও থাকতে পারে। ভদ্রলোকের পেছনে দাঁড়িয়ে হৈম বিকাশের হাত টেনে জিজ্ঞাসু তাকায়, এমন, যাতে ভুরুতে জিজ্ঞাসা ধরা না পড়ে, এমন জিজ্ঞাসা, যা সারাটা মুখের টানটান উদ্বেগে

প্রকাশ হয়ে পড়ে। বিকাশ তলার ঠোঁটটা ভেটকে, 'কী জানি' এ-রকম একটা ভাব করে।

হৈম খুব ঠাণ্ডা গলায় বিকাশকে বলে, 'বড্ড ভিড় এখানে, অন্য কোথাও যাবি, অরিজিৎ?' হৈমর নিচু গলায় কী-এক নিশ্চয়তা আসে, একটু যেন ভারীও শোনায়, বয়সী।

বিকাশ বলে, 'বাদ দাও, এখানেই হয়ে যাবে।'

'ভেতরে বসেও কিন্তু খাওয়া যায়। খাবি?'

শুধু গলার স্বর শুনে কেউ হৈমর বয়স আন্দাজ করতে পারত না, অথবা, এই মুহূর্তে, কথা বলতে-বলতে তার বয়স হু-হু বেড়ে যাচ্ছে, যেমন বাড়তে পারে এক মেয়েদেরই।

বিকাশও নিচু স্বরে হাসতে পারে, 'ঘোঁতন, তোমার মা আমাকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছে।'

'হাইকোর্ট কী মামা? তুমি দেখতে পাচ্ছো? আমাকে তোলো, আমিও দেখব।'

'তুই-না সব সময়ই বলিস বড় হয়েছিস? এখন আমার ঘাড়ে উঠেও দেখতে পাচ্ছিস না?'

'মামা, জানো, বার্নপুরে না—'

হৈম তাড়াতাড়ি ঘোঁতনের কথা থামিয়ে দেয়, ও যদি এখুনি আবার ওর অরিজিৎ মামার গল্প শুরু করে দেয়, 'আচ্ছা, তোদের সেই মহাপাত্র এখনো আছে?'

বিকাশ একটু ভেবে জিজ্ঞাসা করে, 'কোন্ মহাপাত্র?

হৈমর ভয় বেড়ে যায়। সে দ্বিতীয়বার অরিজিৎ নামটা বলেছে, বিকাশকে তুই বলেছে। ঘোঁতন যদি সেটা কানে নেয়। 'আরে, মহাপাত্র, তোদের সঙ্গেই ত বোধ হয় পাশ করল, শিবপুর থেকে, বলতি না, কি ক্রেনে উঠে নাকি ওর মাথা ঘুরে গিয়েছিল।'

'ও। না, না। সে ত মাত্র মাস ছয় ছিল। তার পর ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে আছে।'

ব্যাঙ্কে আবার হাঙ্গানয়ার লাগে না কি?

সামনের আরেকজন নিলেই, ভদ্রলোক। বিকাশ বেশ ব্যক্তিত্ব মিশিয়ে মন্তব্য করে, 'লাগে। টাকার কল মাঝে-মাঝে খারাপ হয় না?' হৈম ফিক করে অকৃত্রিম হেসে ফেলে।

আর ভদ্রলোক যে-মুহূর্তে তার ডিশটা হাতে তুলে নেন, বিকাশ বলে বসে, 'চলো, ভেতরেই যাই, ঘোঁতন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খেতে পারবে না।'

'কে বলেছে মামা পারব না? আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত খাই।'

'তুই ত পারবি। আমি ত পারব না। চল ভেতরে।'

ভেতরে যেতে লাইন ভেঙে এক পা ফেলতেই ঘোঁতন বিকাশের ঘাড়ের ওপর দিয়ে, যেন সাক্ষ্য বাক্যটি ভদ্রলোককেই শোনায়, 'কেন, তোমাদের বার্নপুরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খাও না?'

বসার জায়গাটিতেও ভিড়। মাঝখানে একটা টেবিলের খাওয়া প্রায় হয়ে গেছে। হৈম টেবিলটার পাশে গিয়ে দাড়াতেই ওরা উঠে পড়ল। দাঁড়িয়ে চলটা খেয়ে টেবিল ছেড়ে দিল।

'সবচেয়ে তাড়াতাড়ি যা হয় খেয়ে চলুন, বেশি ক্ষণ বসা যাবে না', বিকাশ সতে-বসতে বলে।

'তোমার কি কিছু মনে হচ্ছে?'

'মনে হওয়া না-হওয়ার ত মানে নেই মানে আমার, দেখে ফেললে ত ভড়কি য়া ছাড়া, সে ত ভালই দেয়া হল। ঘোঁতনবাবু মাভেলাস। ওকে একটা সগোল্লা প্রাইজ। কিন্তু বেশিক্ষণ দেরি করাটা ঠিক নয়।'

'এতক্ষণ ত দিব্যি কথা বলছিলে—'

'সে ত আর আমার বলা নয়, হে—এ',

সঙ্গে সঙ্গে হৈম প্রায় আঁতকে উঠে যেন বিকাশের মুখে হাতই চাপা দেয়, প্লিজ বিকাশ, ঐ হাসি শুনলে আর তোমাকে নিয়ে কারো কোনো সন্দেহ থাকবে না।'

'হাসলে হয়ত আরও ভড়কি খেত।'

'না, না, কোনো ইঞ্জিনিয়ার ও-ভাবে হাসে না। ডুবিও না।'

একটা করে ধোসা খেয়ে ও।য়।, তাড়াতাড়ি পায়ে, বেরিয়ে এল। ঘোঁত আর হৈমকে পেছনে রেখে বিকাশ আগে বেরিয়ে যায়। হৈম এসে বলে, 'চলে ফেরা যাক।'

'দাঁড়ান, একটু ঘুরে ফিরব। আপনার কেনাকাটা সব হয়ে গেছে নাকি?'

হৈম দেখে গড়িয়াহাট তখন আলোতে রঙে আর আওয়াজে ঘুরছে। আলো বিচ্ছুরণে যেন আকাশটাও খানিকটা পরিষ্কার হয়ে থাকে। এই আলো, এ সওদা, এই উৎসব, এই এত মানুষজনের ভেতর হৈম কি বিকাশের জন্য একা নিরাপত্তার আশ্বাস খোঁজে।

উলটো দিকের ফুটে তাকিয়ে হৈম বলে, 'তা হলে চলো, বিহার এমপোরিয়ামটা যাই।' বাসরাস্তা-ট্রামরাস্তা, ট্রামরাস্তা-বাসরাস্তা পেরতে-পেরতে ফুটপাতে উঠতে উঠতে হৈম বলে, 'কিছু সন্দেহ হচ্ছে তোমার, বিকাশ?'

'কী জানি, দেখেছি বলে ত মনে পড়ে না।'

কাকে?'

'ঐ লোকটাকে।'

'তুমি কি সব লোককেই চেন না কি?'

'আমাকে যে চিনে খুঁজে বের করবে বলে ঘুরছে তাকে ত আমাকেও চি রেখে খুঁজতে হবে ত?'

'তুমি পুলিশের সব লোককে চেন বলছ।'

'না, সেপাই-কনস্টেবলদের চিনি না, এই সব প্যান্ট-শার্ট বাবুদের চিনি।'

'মানে?'

'দালাল, মধ্যবিত্ত অফিসারদের।'

পথের মাঝখানেই হৈম প্রায় ঘুরে বিকাশের দিকে তাকায়। বিকাশ হৈ দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, 'এ ত যুদ্ধের ব্যাপার, হত্যাকারীকে বাঁচিয়ে রাখ নাম মৃত্যু, আমরা খতম করব না এই সব খোঁচর দালাল ছারপোকাদের?'

ঘোঁতন বিকাশের মুখে হাত দেয়, 'মামা, তুমি রাগ করছ কেন?'

হৈম দুদিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলে, 'বিকাশ!'

বিকাশ ঘোঁতনের হাতটা সরিয়ে দিয়ে হৈমকে বলে, 'ও লোকটা তাক

ন ও-রকম? সেজন্যই ত ঢুকলাম সোজা ভেতরে, ওর পাশে দাঁড়ালাম। ও
দ চিনেও থাকে সাহস করে ধরতে পারল না, ভাবল আমিই ওকে খতম করতে
কছি।'

হৈম আবার দুদিকে আশঙ্কিত তাকায়, প্রায় দাঁড়িয়ে গিয়ে চাপা গলায়
সিয়ে ওঠে, 'বিকাশ!'

'বুঝলেন? সাহস, সাহস। এই ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বানানো পুলিশ-সৈন্য
, সব ত শেকলে রাইফেল বেঁধে ঘুরছে আর বিছানাতে শুয়েও ভয়ের চোটে
ুতে পারে না। রাইফেলও চাই, শেকলও চাই। হ্যাঃ,' বিকাশ ঘৃণায় উপেক্ষায়
জের সমস্ত শরীরটাকে ঝাঁকি দেয় আর সোজা হয়ে দাঁড়ায়: ঘৃণায় মোচড়ানো
থচ দৃঢ় সেই শরীরটাতে একটি শিশুকে সে কেমন অনায়াস এক হাতে বুকে
গলে রাখে, আরেক হাত ছড়িয়ে দেয় পাশে, যেন সেটা সেই সন্ধ্যার গড়িয়া-
টের সবার মাথার ওপর দিয়ে উঠতে পারে।

দোকানটার দরজায় এসে হৈম বলে, 'ওকে কোল থেকে নামিয়ে দাও না।'

বিকাশ ঘোঁতনকে কোল থেকে মেঝেতে দাঁড় করায়। লম্বা দোকানের
ছনের দেয়াল জুড়ে আদিবাসীদের বল্লম, তীরধনুক, ঢাল, হাঁসুয়া, দা, কাস্তে,
াজালি, ছুরি, মধুবনী ছবি—রামসীতার বিবাহ, রামের বনবাস, সীতালুণ্ঠন,
তার অগ্নিপরীক্ষা। হৈম এক কানে কাপড়-চোপড় দেখছিল।

ঘোঁতন বিকাশকে বলে, 'মামা, আমি ঐ তীরটা নেব!'

'এগুলো কি বিক্রির?'

'না। এগুলো ত সব সাজানোর।'

বিকাশ সরে যায় প্রায় দরজার কাছে। ঢোকার সময় দেখে নি, বাঁদিকে দরজার
শর শো-কেসে কালো মাটির মডেলে আদিবাসী পুরুষ-রমণী নাচছে, না, শিকার
ছে। চোখ ঘুরিয়ে নেয় বিকাশ। ঘোঁতন বড় মেঝেটাতে হাঁটছে।

প্যাকেট বুকে চেপে হৈম বেরিয়ে আসে। 'চলো। কিন্তু তোমার কাজটা ত
না?'

'না, এখন যাব না, হয়ত ফলো করছে আমাকে, ফিরে চলুন —' ঘোঁতন এসে
ার বিকাশের আঙুল ধরে। 'উলটো দিকে চলো, ট্যাক্সি পাওয়া যাবে', হৈম

বলে।

একটু এগোতেই দু-তিনটি ট্যাক্সি। হৈম ট্যাক্সিতে উঠতে-উঠতে বলে 'সা এভেন্যু দিয়ে', থেমে বিকাশকে জিজ্ঞাসা করে, 'ঘুরে যাবে নাকি?'

'সোজাই চলুন।'

বাইরের ঘরের চেয়ারে বসে সবাই যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচে। 'এই যে তো কী যেন, ওয়ার্কিং ক্লাশ', হৈম এক নীল আর শাদা বাণ্ডিল বিকাশকে ছুঁড়ে শাদা পাজামা আর নীল পাঞ্জাবি। বিকাশ মুখ খোলার আগেই আবার এ লাল তার কোলে এসে পড়ে. 'আর, তোমার কী যেন, গ্রামের, রুরাল পুও বিকাশ খুলে দেখে লাল গামছা।

'এ কী করেছেন কাণ্ড, না, চেয়ারম্যানের নির্দেশ, আত্মগোপনের সময় ক কাছ থেকে কিছু নেয়া যাবে না, দাম ছাড়া'।

বিকাশের কোলে একটি কমলা রঙ উড়ে এসে পড়ে, 'এই তোমার, কী শহুরে, আরবান ইনটেলেকচুয়াল'। কাঁধে-ঝোলানো ব্যাগ।

'না না, এ হবে না। আমাদের স্ট্রিকট ডিসিপ্লিন।'

'এ ত তোমাদের এম-এমের দায়িত্ব, তোমার কি এল-গেল?' দরজায় পড়ে।

শৌরীন্দ্রের গলা শোনা যায়, 'ঘোঁতন।' যেদিন শৌরীন্দ্র তাড়াতাড়ি সেদিন দরজা খোলে না, ঘোঁতনকে ডাকে। হৈম লাফিয়ে ওঠে। ঠোঁটে ত দিয়ে সবাইকে চুপ থাকতে বলে। ঘোঁতনকে কোলে তুলে নিয়ে নিজে বিকাশের ঘরে লুকোতে-লুকোতে বিকাশকে দরজা খুলতে বলে। বিকাশ নাড়িয়ে শৌরীন্দ্র দাঁত বের করে পারবে না জানায়। বিকাশের ঘরের দরজা হৈম বিকাশকে চোখ পাকায়, তার পর পর্দার আড়ালে চলে যায়। 'ঘো শৌরীন্দ্রের গলা আবার শোনা যায়।

মায়ের কোলে ঘোঁতন উত্তেজনায় পা-ছোঁড়ে আর মায়ের কানের মুখ নিয়ে বলে, 'মা কথা বোলো না, চুপ।'

হৈম ঘোঁতনের ঠোঁটে হাত দেয়। হুড়কো খোলার শব্দ

তন মায়ের কাঁধে মুখ লুকোয়। কপাট খোলার শব্দ আসে। তার পর কোনো শব্দ নেই। পর্দাটা তুলে হৈম দেখার চেষ্টা করে। ঠিক সেই মুহূর্তে শের গলা শোনা যায়, 'আসুন' যেন র গলা দিয়ে বেরিয়ে এল শৌরীন্দ্রর ার শব্দ পাওয়া যায়, চৌকাঠ ডিঙলো। তার পর দরজা আবজানোর য়াজ, কে আবজে দিল বোঝা যায় না। নব ঘোরানোর আওয়াজ, কে, বোঝা না। আর ঘেঁাতন খিলখিল হাসিতে মায়ের কাঁধে ভেঙে পড়ে। সেই হাসির রেই চিৎকার করে বলে, 'বাবা, মামা।' মায়ের কোল থেকে হিঁচড়ে নেমে তন লাফিয়ে হলঘরে ঢুকে হাততালি দিতে থাকে, 'বাবা মামা', 'বাবা মামা।'

পেছনে খোঁপা জড়াতে-জড়াতে হৈম একগাল হাসি নিয়ে ঢোকে। ...ীন্দ্র তখনো বসার চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে আর তার পেছনে দরজার দিকে দিয়ে বিকাশ মাথা নিচু করে, আঙুলগুলো ঠোঁটের কাছে, যেন তুলছে না। তনের সঙ্গে হৈমও ঝরঝর হেসে বলে, 'বি-কাশ!' যেন বাচ্চা বিকাশকে ার পর শৌরীন্দ্র এই বড় বিকাশকে আবার দেখছে— মিতা বললেই সমস্ত বিচয় মুহূর্তে দূর হয়ে যাবে। কিন্তু শৌরীন্দ্র যখন গম্ভীর চোখ ঠাণ্ডা তুলে র চোখে চোখ রেখে শুধোয়, 'বিকাশ?' তখন হৈমর কেমন মনে হয়, রীন্দ্রের কি সত্যি মনে পড়ছে না? বিকাশও দরজা থেকে চোখ তুলেছে, চোখ চটো। একটু কেশে, হৈমকে, গলা থেকে হাসি ঝেড়ে ফেলতে হয়।

'তুমি কাল যাঁর আসার কথা বলেছিলে। আজ দুপুর এসেছেন। এস-এম।' কথাটি বিকাশের দিকে তাকিয়ে একটু অন্য স্বরে বলা।

'ও', শৌরীন্দ্র ঘুরে বিকাশের দিকে তাকায়, 'বসুন। আমি এগুলো রেখে দচ্চি।'

...ত পা গিয়ে আবার ফিরে শৌরীন্দ্র জিজ্ঞাসা করে, 'দুপুরের খাওয়া-দাওয়া...' বাক্যটি শেষ হয় না। বিকাশ মাথা নাড়ে আর হৈম কোনো জবাব দেয় না। চেয়ারের মাথার ঢাকনা ঠিক করছিল। শৌরীন্দ্র কি সম্পূর্ণ ভুলে গেছে কাল ত বিকাশ নামে ছেলেটি তাদের দরজায় মরা গেছে, এটিই এখন পর্যন্ত তার া আছে। বিকাশ নামটি ত শৌরীন্দ্রের মনে কোনো স্বস্তি আনে না। শৌরীন্দ্র র দিকে এগিয়ে গেলে, হৈম সেদিকে যায়।

ঘরে এসে শৌরীন্দ্র কাঁধের ব্যাগটি রাখে, তার পর হৈমকে জিজ্ঞাসা করে 'কখন এসেছেন ?'

'এই সাড়ে এগারটা-বারটা নাগাদ।'

'কী বললেন ?'

শৌরীন্দ্র জামার হাতার বোতাম খুলছিল।

'তুমি আছ কিনা জিজ্ঞেস করলেন, নেই শুনে চলে গেলেন।'

ঘেঁাতন 'বাবা' 'বাবা' করে ঢুকল। 'ঘেঁাতন, তুমি মামার সঙ্গে গল্প করো, বা একটু হাত-মুখ ধুয়ে আসুন।'

'মা, আমি মামাকে নিয়ে মিসাম্মাদের বাড়িতে যাব ?'

'মামাকে নিয়ে যাবে কেন।'

'বাঃ মিসাম্মার মাসি আছে, আমারও মামা আছে।'

'না, এত রাতে আর যায় না। তুমি মামার সঙ্গে গল্প করো।'

'আচ্ছা।' ঘেঁাতন আবার ছুটে বেরিয়ে যায়।

শৌরীন্দ্র মোজা খুলছিল—বিছানায় বসে। 'আবার পরে এলেন ?'

'না। তুমি কখন ফিরবে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি, ঠিক নেই, বলার প চলে যাচ্ছিলেন, কী বললেন পরে আসবেন, তখন আমি ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম

শৌরীন্দ্র স্নানঘরে ঢুকতে গিয়ে দাঁড়িয়ে শুধোয়, 'কী জিগগেস করলে ?'

হৈম একটু ভেবে হেসে ফেলে, 'আমার ত ঠিক মনে পড়ছে না, কেমন ক যেন জানা গেল, ও বিকাশ, ওর এখানে থাকার কথা।'

'এ-সব কি ঘরে বসে কথা হয়েছে,' স্নানঘরের ভেতরে ঢুকে আবার আলো জ্বালাবার জন্য হাত বের করে শৌরীন্দ্র জিজ্ঞাসা করে।

'না না। আমি ত জানলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছি। দাঁড়াও, পাজামা নাও

হৈম যখন ওয়াড্রোব থেকে পাজামা বের করে তখন শৌরীন্দ্র জিজ্ঞাসা ক 'তুমি না ডাকলে কি চলেই যাচ্ছিলেন ?'

'হ্যাঁ—ত।'

চায়ের জল তুলে হৈম একটু আনমনাই হয়ে যায়। শৌরীন্দ্র যেন আ কিছু ভাবছে। এই সমস্ত বিষয়টিই হৈমর জানার এত বাইরে যে শৌরীন্দ্র

ই খুশি না-হওয়ায় বা এত প্রশ্ন করায় সে ভাবতে বসে। কিন্তু কিছুতেই তার নে আসে না বিকাশকে কেন সে ফিরে ডেকেছিল। শৌরীন্দ্র নেই শুনে বিকাশ যন কোন্ পথে যাবে ঠিক করতে পারছিল না। নাকি, হঠাৎই হৈমর মনে হয়েছিল ছলেটি কি সেই, ছেলেটি, নইলে এমন অসময়ে আসবে কেন। নাকি, হৈম াইছিলই ছেলেটি বিকাশ হোক। কিন্তু শৌরীন্দ্র কি কাল রাতের কথাটা ভুলে গছে, নইলে ত তার ভাবনা ঘুচে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যাই হোক আর শৌরীন্দ্র যাই ভাবুক, হৈম ত খুব সাবধান ছিল। জানালা দিয়েই সব কথা সেরেছে। সামনের বাড়ির দোতলার বারান্দা মুছছিল তখন ওদের কাজের ময়েটি।

হলে এসে দেখে বিকাশ বা ঘোঁতন নেই; জামা-কাপড়-ব্যাগ-গামছা চয়ারটার নানা জায়গায় লেগে আছে। ঘরের পর্দা তুলে দেখে দুজনে মেঝের পর বসে, বিকাশ কাগজ দিয়ে কী বানাচ্ছে। 'কী? সব ঘরের ভেতর ঢুকেছ ন?' তোমার এস-এমের সঙ্গে আলাপ করবে না?' হৈম কিছু না-ভেবেই থাটি বলে ফেলে, তার পর বিকাশকে দেখে। বিকাশ তখন হাতের কাগজ মাটিতে রখে হাত জোড় করে হৈমর দিকে ফিরে চোখ-মুখ কুঁচকে কথা না-বলে নিবেদন রে, যেন তাকে শৌরীন্দ্রের সামনে না ডাকে। ঘোঁতনও বলে ওঠে 'মা মা', তার র বিকাশের মত হাত জোড় করে হৈমর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকায়। মারে অচ্ছা বোকা ত, এ কি বাঘ না ভালুক?' হৈম পর্দাটা ফেলে দেয়। ান্নাঘরে ফিরে আসতে-আসতে হৈম অনুমানের চেষ্টা করে শৌরীন্দ্র কী ভাবছে। কন্তু শৌরীন্দ্রের অতগুলো প্রশ্নের পর বিকাশকে আবার দেখে এসে হৈম বুঝে য় না, শৌরীন্দ্র ভাবছেটা কী। জল হয়ে গিয়েছিল, চা ভেজাতে-ভেজাতে হম ঠিক করে সবাইকে নিয়ে হৈ হৈ করে চা খেতে বসে গল্পগুজব জুড়ে দিলেই ক হয়ে যাবে। আগে থাকতে ও প্রস্তুত নেই এমন কোনো কিছুর হঠাৎ সম্মুখীন লে শৌরীন্দ্র প্রথমে একটু গুটিয়ে যায়, একটু সতর্ক, একট কাঠ-কাঠ হয়ে যায়। শৌরীন্দ্র অপ্রস্তুত হতে পছন্দ করে না। ভুল হয়েছে বিকাশকে দিয়ে দরজা খোলানো। তার চাইতে বিকাশ যদি ঘরে থাকত আর শৌরীন্দ্র যদি, যেমন রোজ, সার জায়গাতে বসে-বসে জামা-জুতো খুলে, ঘোঁতনের সঙ্গে একটু-আধটু

রগড়ের পর স্নানে যেত, আর স্নান সেরে চা খেতে-খেতে যদি হৈম খবরটা দিত—সবিস্তার ঘটনাটা বলে, তা হলে হয়ত শৌরীন্দ্রই বিকাশকে ডেকে আনত। আর বিকাশেরই দরজা খোলা, বসার জায়গায় ঐ-সব জামা-পাজামার ছড়াছড়ি, ঘোঁতন বা হৈমর না-থাকা শৌরীন্দ্রকে বেশ খানিকটা ধাক্কা দিয়েছে। হৈম যেন এতক্ষণে একটু স্বস্তি পায়, যেন শৌরীন্দ্র বেশ স্নানটান করে ঠাণ্ডা হয়ে বেরলে কোনো খটকা থাকবে না।

কিন্তু যদি কোনো খটকা থাকেও সে-খটকা দূর করার দায় হৈমর কেন? বিকাশ ত শৌরীন্দ্রেরই অতিথি। বিকাশ বলে ছেলেটির সঙ্গে শৌরীন্দ্রের আগে, আর সারাটা দিন ধরে, চেনাজানা হয়ে আছে বলেই কি বিকাশ হৈমরই দায় হয়ে উঠে, মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয়েরই দায়ে?

ট্রে সাজিয়ে হৈম টেবিলে নিয়ে যায়। বিকাশকে ডাকতে গিয়েও ডাকে না—আগে শৌরীন্দ্র আসুক। শৌরীন্দ্র স্নানঘর থেকে বেরিয়েছে। ট্রে-টা রেখে হৈম ঘরে গেল। শৌরীন্দ্র তখন চুলে চিরুনি চালাচ্ছে।

ছাড়া জামাকাপড় গুছিয়ে তুলতে-তুলতে হৈম জিজ্ঞাসা করে, 'ঘরে চা দেব না টেবিলে বসবে?'

'টেবিলেই দাও, ঘোঁতন কোথায়?'

'নতুন লোক পেয়েছে, তার সঙ্গে ত রাজ্যের কথা চলছে সারাদিনই।'

'সারা দিনই?'

'ঐ আর কি!' হৈম বেরিয়ে যায়।

টেবিলে এসে পটের ভেতর চা-টাকে একবার নাড়িয়ে দেয়। ঘোঁতনকে ডাকতে গিয়ে ডাকতে পারে না। কিন্তু ঘোঁতন যদি টেবিলে থাকে তা হলে শৌরীন্দ্রই হয়ত বিকাশকে ডেকে আনবে। হৈম শুধু ঘোঁতনকে ডাকে কী করে?

শৌরীন্দ্রের চটির শব্দ শুনে হৈম ডেকে ফেলে, 'ঘোঁতন, শুনে যা।'

'মা, দাঁড়াও, একটু পরে আসছি।'

'শুনে যা না।'

শৌরীন্দ্র এসে চেয়ারে বসে। ঘোঁতন ছুটে আসে, 'দাঁড়াও না, মা। বাবা বাবা, মামা একটা জেটপ্লেন বানিয়ে দিচ্ছে, এ রকম করে উঠে না এই রকম

করে ঘুরে, এই রকম করে নেমে এই রকম করে দাঁড়াবে,' হাতটা টান-টান করে ঘুরে-ঘুরে ঘোঁতন তার সম্ভাব্য প্লেনের প্রস্তাবিত যাতায়াত বোঝায়।

শৌরীন্দ্র হেসে ফেলে, বলে, 'একটা বিস্কুট খেয়ে যা।'

'তুমি খাও, আমি খাব না,' বলে বিকাশের ঘরের দিকে ছুটতে গিয়ে ঘোঁতন ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, 'বাবা, দুঃখ?'

'হ্যাঁ, দুঃখ।'

'তা হলে দাও'. ঘোঁতন বাবার কাছে যায়।

শৌরীন্দ্র ছেলেকে বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে, ডান হাত দিয়ে একটা বিস্কুট ছেলের মুখে ধরে 'একটুস কুটুর করে দে।'

মুখ সরিয়ে নিয়ে ঘোঁতন বলে, 'দুটো দাও, মামাকে দেব।' শৌরীন্দ্র আর একটা বিস্কুট ঘোঁতনের হাতে দেয়। দুটা বিস্কুট নিয়ে ঘোঁতন ছুট দেয়।

শৌরীন্দ্র জিজ্ঞাসা করে, 'ওকে চা দিয়েছ?'

'না। এখানে ডাকব?' চা ঢালতে-ঢালতে খুব আস্তে জিজ্ঞাসা করে হৈম।

'হ্যাঁ। ডাকো।'

হৈম চা ঢালা শেষ করে গিয়ে পর্দা তুলে ডাকে, 'বিকাশ, এসো চা খাবে।' বিকাশ তাকায়, কিন্তু হৈম পর্দাটা ফেলে আবার টেবিলে চলে আসে।

শৌরীন্দ্র চায়ে চুমুক দেয়। বিকাশ কাগজের প্লেনটা বানাতে বানাতে এ ঘরে আসে, পাশে ঘোঁতন, দরজা পেরিয়ে একটু দাঁড়িয়ে বসার জায়গার দিকে যায়।

হৈম ডাকে 'এখানে।' বিকাশ এসে দাঁড়ায়।

শৌরীন্দ্র বলে, 'বসুন।'

বিকাশ পাশের দিকের চেয়ারে বসে পড়ে। শৌরীন্দ্র বিস্কুটের ডিশটা বিকাশের দিকে এগিয়ে দেয়। বিকাশ তখনো মাথা নুইয়ে প্লেনটা বানিয়েই যাচ্ছে। 'মামা, হয়ে গেছে, এবার তা হলে ওড়াও, ওড়াও।' বিকাশ প্লেনটা তুলে সিলিং-এর দিকে ছুঁড়ে দেয়। প্লেনটা একটা পাক খেয়ে নীচে নেমে, আর-একটা পাক খেতে গিয়ে বিপরীত দিকের জানলার পর্দায় ধাক্কা খেয়ে, নীচে পড়ে। ঘোঁতন হাততালি দিয়ে ওঠে। দৌড়ে গিয়ে প্লেনটা তোলে। 'মামা, এখান থেকে

ওড়াই?' বিকাশ মাথা নাড়ায়। ঘোঁতন প্লেনটা ছুঁড়ে দেয়। বেশি জোরে ছোঁড়ার জন্যই হোক বা প্লেনটা চেপে ধরেছিল বলেই হোক—প্লেনটা একবার একটু পাক খেয়েই পড়ে যায়। 'মামা, কই উড়ল না ত?'

হৈম বিকাশের দিকে চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে বলে, 'উড়বে, উড়বে, তুমি ঠিক করে ওড়াও।'

'আপনি ত দুপুর বেলায় এসেছেন?'

মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' জানিয়ে বিকাশ চায়ে চুমুক দেয়।

'কোনো অসুবিধে হয় নি ত?'

'না অসুবিধে আর কী হবে সে ত সবই হচ্ছে।'

'মানে, কী বললে. তোমার সবই অসুবিধে হচ্ছে?' হৈম হেসে শুধোয়।

'না তা ত কিছু কথা নয় অসুবিধে হতে পারে।'

'উড়েছে, উড়েছে, দেখো দেখো,' ঘোঁতনের প্লেনটা পাক দিচ্ছিল।

'তুমি ওর কথা শুনে ঘাবড়িয়ো না,' হৈম শৌরীন্দ্রকে বোঝায়, বিকাশ কেমন।

'ন না. আমি বুঝতে পারছি,' শৌরীন্দ্র বলতে গিয়ে হাসে বটে, কিন্তু তার পরই গম্ভীর হয়, 'দুপুরে ত আমার অফিসে থাকার কথা। ও যদি আপনাকে চিনতে না পারত ত অসুবিধেয় পড়তেন।'

'না সকালেই হয়ত আসা যেত কিন্তু ঘুরে আবার এক জায়গায় বহুক্ষণ দাঁড়াতে পুলিশের গাড়ি ছিল তাই দেরি হয়ে গেল।'

'কিন্তু ও আপনাকে চিনতে না পারলে ত আজ অসুবিধেয় পড়ে যেতেন।'

'হ্যাঁ তা ত।

'তা হলে এতটা রিস্ক না নিয়ে অন্য কোথাও— ।'

'হ্যাঁ তাই করতে হত। কিন্তু সে ত সব মিটেই গেছে, উনি ত বুঝতে পেরেই আর-সব ব্যবস্থা সব ত হয়ে গেল।'

শৌরীন্দ্র কাল রাতের কথাটা একবারও জিগগেস করছে না কেন? সত্যিই ভুলে গেছে?

'জানো, বিকাশকে তোমার এই পাঞ্জাবিটা পরতে দিয়েছি, পরবে না।' বিকাশ চোখে নিষেধ নিয়ে হৈমর দিকে তাকায়। শৌরীন্দ্র দেখে। হৈম শৌরীন্দ্রকে বলে

চলে, 'বলে, এই কাজ-করা পাঞ্জাবি নাকি ফিউডাল।' শৌরীন্দ্র হেসে ফেলে।

'তা ত বটেই, এ ত সব মুসলমানি দরবারি ঐতিহ্য,' শৌরীন্দ্র বিকাশের দিকে তাকিয়ে বলে।

'তার পর ত আমার মহা বিপদ। তোয়ালে দেই, বলে, বুর্জোয়া : পাজামা দেই, বলে, পেটিবুর্জোয়া ; শেষে সারাদিন কোনো রকমে কাটিয়ে বিকেল বেলা গড়িয়া-হাটে গিয়ে নিয়ে এলাম, দেখো,' বসার জায়গা থেকে জিনিশগুলো নিয়ে এসে হৈম শৌরীন্দ্রকে দেখায়, 'পাজামা, পাঞ্জাবি আর গামছা।' শৌরীন্দ্র একে-একে তুলে দেখে। হৈমর মনে হয়, সে যেমন চেয়েছিল, শৌরীন্দ্র আর বিকাশকে নিয়ে পরিবেশটা যেন তেমনি হয়ে উঠেছে। না হওয়ার ত কথা নয়। তারই ভুল হয়েছিল, বিকাশকে দিয়ে দরজা খোলানো।

শৌরীন্দ্র বলে, 'এগুলো পরতে আপত্তি নেই ত?'

'ব্যস, বিকাশ, তোমাদের এস-এম বলে দিয়েছেন, আর-ত তোমার কোনো ওজর চলবে না।'

'কেন কী হল?'

'তুমি জানো না, সে আসার পর থেকে বলছে, ও যেদিন প্রথম শুনল তোমার বাড়িতে ওকে থাকতে হবে, ওর নাকি রাতে ঘুম নেই, তোমাকে দেখতে পাবে এই ভেবে।'

'কেন,' শৌরীন্দ্র ভুরু কুঁচকে হৈমকে জিজ্ঞেস করে, তার পর বিকাশের দিকে তাকায়।

ঘোঁতন এসে বলে, 'মামা, প্লেনটা ভেঙে গেল।' প্লেনের লেজ আর মাথা আলাদা হয়ে আছে।

'কোনো জিনিশ নিয়ে তুমি খেলতে পারো না, সব কিছু ভাঙো,' হৈম বলে।

বিকাশ ঘোঁতনের হাত থেকে প্লেনটা নিয়ে বলে, 'আবার বানিয়ে দেব।'

'তোমার লেখা নিয়ে নাকি ওদের ক্লাশ হত, তোমার লেখা নাকি ওরা সবাই পড়ত। সেই এস-এমকে চর্মচক্ষুতে দেখবে ভাবতেই পারে নি,' হৈম হাসল।

শৌরীন্দ্র বলল, 'হুঁ।'

'কী বিকাশ, এখন কথা বলছ না কেন?'

'এই ত সব কথা বলা হচ্ছে ত আপনি বলছেন ত।'

'মামা চলো, প্লেন বানাবে, চলো না, বাবা মামা প্লেন বানাক?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তুমি বেশি রাত করো না, তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবে।'

'না, আমি তোমাদের সঙ্গে খাব।'

'আচ্ছা সে হবে খন, এখন মামার সঙ্গে প্লেন বানাও ত।' বিকাশ উঠে ঘোঁতনের হাত ধরে ঘরে যায়।

'আজ কি কেউ এসেছিল?'

'না ত,' ট্রের ওপর চায়ের বাসন গোছাতে-গোছাতে হৈম বলে, 'এক বিকেলের দিকে যদি কেউ এসে থাকে।'

'কেন, তোমরা ছিলে না?'

'বললাম-না, গড়িয়াহাটে গিয়েছিলাম।'

শৌরীন্দ্র সোজা হয়ে বসে, বিকাশের ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে প্রশ্নে ঘাড়টা ঝাঁকায় ও ভুরু কুঁচকায়। হৈম সামনে ঘাড় নাড়িয়ে বোঝায় বিকাশও গিয়েছিল; শৌরীন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'শুনে যাও।' চায়ের বাসন-কোসনের ট্রে টা রান্নাঘরে রেখে হৈম ঘরে যায়। শৌরীন্দ্র বিছানায় বসে।

'এখানে আশ্রয় নিতে এসেছে, আত্মগোপন করছে, অথচ তোমার সঙ্গে বিকেল বেলা গড়িয়াহাট গেল, আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না।'

'না, না, ও একেবারেই নিয়ে যেতে চায় নি', হৈম পাশে বসে, 'আমি প্রায় জেদাজেদি করে গেছি, ট্যাক্সিতে অবশ্য।'

'ট্যাক্সি পেলে কোথায়?'

'এই এখান থেকে এদিক দিয়ে বড রাস্তায় পড়তেই পেয়ে গেছি।'

'বিকেল বেলা ত?'

'হ্যাঁ, এইটুকু ত রাস্তা।'

'কিন্তু পাশাপাশি বাড়ির সবাই ত দেখেছে।'

'তারা কেউ দেখে নি. আর দেখলেই বা হয়েছেটা কী, আমার বাড়িতে আমার গেস্ট আসতে পারে না?'

শৌরীন্দ্র চুপ করে যায়। কিন্তু হৈম বোঝে শৌরীন্দ্র শুধু একটা আশঙ্কা থেকেই

কথা তোলে নি, তার ভেতরে আর-একটা কোনো ভাবনা আছে। তার কোনো আন্দাজ পাচ্ছে না হৈম, কিন্তু শৌরীন্দ্র কেন যেন খুব সহজ হতে পারছে না। নতুন লোকজনের সামনে শৌরীন্দ্রের স্বাভাবিক অসহজতা থেকে এর ধাত যেন আলাদা।

'না। চার পাশে পুলিশ থইথই ত, চব্বিশ ঘণ্টা চলছে আঁচড়ানো, সারা এলাকায়। আক্রমণও হয়ে গেছে কয়েকটা। তার ভেতর ঢাকুরিয়ার রাস্তা দিয়ে গড়িয়াহাটা, যে লুকিয়ে আছে, ভাবতে পারছি না, ট্যাক্সি ত আর অদৃশ্য হয়ে যায় না?'

হৈম শৌরীন্দ্রকে মিনতি করে, 'না, না, তুমি বিকাশের দোষ দিও না, ও কিছুতেই নিতে রাজি হয় নি, আমি প্রায় জোর করে গেছি।'

'মানে, ও একাই যাচ্ছিল?'

'হ্যাঁ, কী কাজ আছে বলল।' আমি বললাম আমিও যাব।

'বিপদটা হলে ত তোমারও হত, তার ওপর ঘোঁতনকে নিয়ে, আমাকে একটা ফোন করতে পারতে ত, ছেলেটি এসে যাওয়ার পর।'

'তা অবিশ্যি করা যেত, কিন্তু এই ছেলেটি এসে পড়ায় আমার হঠাৎ এমন—'

'কেন?"

'মানে, কাল রাত্তিরে তা হলে এ আসে নি ত।'

'ও,' এই প্রথম শৌরীন্দ্র গতরাতের ঘটনা নিয়ে একটি ধ্বনি উচ্চারণ করল। একটু থেমে যোগ করল, 'কী করে জানলে কাল রাত্রিতে বিকাশ আসে নি?'

'সেটা জিগগেস করতেই ত ওকে আমি আবার ডাকলাম, ও ত চলেই যাচ্ছিল, তুমি নেই শুনে।'

'ও ফিরে এসে তোমাকে বলল যে কাল রাতে ও আসে নি।'

"ও বলবে কী করে, আমি জিজ্ঞাসা করলাম'

'না, তোমার কথার জবাবে ও যখন বলল ও কাল রাতে আসে নি তখন—'

'হ্যাঁ, জানো, আমি না প্রায় চমকে গেছি শুনে আর এমন অবস্থা হল যে শেষে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে না যায়, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, ও মানে বিকাশ কাল আসে নি, বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম।'

'ও বারবার একই উত্তর দিতে লাগল ত?'

'হ্যাঁ। না, মানে, আমি কি আর তিন সত্য করানোর মতো জিজ্ঞাসা করেছি? ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কথাটি তুলেছি।'

'ও ঘুরিয়ে-ফিরিয়েই বলেছে, আসে নি।'

'না, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে না, মানে, আমি বুঝতে পারছিলাম, বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কাদের ভেতর মারামারি, কী হয়েছিল, কে কাকে মারল।'

'মানে যেন তুমি সব জান, এই ত?'

হৈম চুপ করে যায়, যেন, স্মৃতি হাতড়ায়, তাই কি ছিল বিকাশের প্রশ্নগুলোর পেছনে, না ত বরং বিকাশই যেন, 'যেন বিকাশই সব জানতে চায় এই রকম।'

'তে মাকে জিজ্ঞাসা করল কাদের কাদের ভেতর মারামারি হয়েছে?'

'মনে পড়ছে না বাবা, কিন্তু তোমার মতো করে কি আর ও প্রশ্ন বানাতে পারে, নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলছিল।'

শৌরীন্দ্র জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা ছেলেটি কি এই রকম করেই কথা বলে যাচ্ছে?

'সে ত এক কাণ্ড আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না, কী রকম কোনো কথাই শেষ করে না, পরে এমন মজা লাগল না!'

'কেন?'

'ওর কথার এমনি কোনো গোলমাল নেই, মানে সে ত তোমার-আমার কথাতেও আছে, ও শুধু আগেরকথাটা শেষ না হতেই পরের কথা শুরু করে দেয়।'

'তুমি এতটা লক্ষ করেছ?'

'কথা বললে তুমিও লক্ষ্য করতে।'

'আমি ত একটু বললাম, একটু বানানো মনে হয় না, তোমার?'

'কী?'

'মানে ওর কথা বলাটা একটু যেন বেশি বোকা-বোকা, থিয়েটারের বোকার মত।'

'তোমার বোকা মনে হল?'

'বোকা ঠিক নয়, কিন্তু কেমন বানানো।'

হৈম একেবারে চুপ করে যায়।

শৌরীন্দ্র বলে, 'কী? কিছু বলছ না যে?'

'কী বলব? তোমার সঙ্গে আমার এত তফাৎ কেন, বুঝতে পারছি না।'

'কেন?'

'আমার ত ওকে বানানো মনে হয়ই নি, বরং যেন একটু অ্যাবসার্ড। ভীষণ সৎ, সততাটা একেবারে ইনটিগ্রাল।'

'কী রকম?'

'কী-রকম?' হৈম একটু ভাবতে বসে, ধরো, স্নানের পর তোমার পাঞ্জাবি দিলাম পরতে, তোমার গুরু পাঞ্জাবি, সামনে সুতোর কাজ করা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'ওটা পরবে না। বলে ওটা নাকি ফিউডাল।'

শৌরীন্দ্র হেসে ফেলে, 'তুমি ত একেবারে—' টোট্যালি কনভিনস্‌ড কথাটির বাংলা চট করে মনে আনতে না পেরে, শৌরীন্দ্র কথাটা আর শেষ করে না।

'তুমিও ত বললে ফিউডাল।'

'পাঞ্জাবির আবার ফিউডাল কী?'

'তুমি যে বললে'

'তুমিও মজা করে বললে, আমিও বললাম।'

'বিকাশটা আসলে অ্যাবসার্ড। এই-সব নিয়ে কোনো মজা-ফজা নেই।'

'তোমাকে কি শুরু থেকেই দিদি বলছে?'

'কোনো সময়েই বলে নি।'

'ঘোঁতন ত দেখছি মামা বলতে অজ্ঞান।'

'তুমি কাল বলেছিলে না আমার ভাই বলতে।'

'হ্যাঁ।'

'অরিজিতের নাম-ঠিকানা, কাজকর্ম, কোন্ বছর পাশ করেছে, সব বলে রেখেছি।'

'ডাকছ ত বিকাশ বলেই?'

'হ্যাঁ।' একটু থেমে হৈম যোগ করে, 'চট করে অরিজিৎ বলে আর-কাউকে

ডাকতে পারছ না।'

'ও তোমাকে দিদি ডাকছে প্রথম থেকেই?'

'বললাম না, না। এমন রাগ হয়ে গেছে না! বিকাশ আসার পর থেকেই ত শ্রীমান এঁটুলি হয়ে লেগে আছে, আমি নিয়ে এসে স্নান করানো-খাওয়ানো এই-সবের ব্যবস্থা করছি, ছেলে ত ত্রাহি কান্না।'

'কেন?'

'মামার সঙ্গে করব।'

'বা বা।'

'তখন বিকাশ এসে রান্নাঘরের কাছে দাঁড়িয়ে এই যে বলে ডাকছে।'

'কাকে?'

'আমাকে। এত রাগ হয়ে গেছে না! আমি বললাম ও-রকম করে ডাকবে না, দিদি বলতে না চাও মিসেস চ্যাটার্জি বলবে।'

'তার পর?'

'তার পর থেকে ডাক,ডাকির ভেতরেই যায় নি। খেতে-খেতে আমাকে বোঝাল, দিদি ডাকাটা ফিউডাল আর মিসেস চ্যাটার্জি ডাকাটা বুর্জোয়া।'

কনুইয়ে ভর দিয়ে শৌরীন্দ্র এমন কাত হয় যে এতক্ষণে হৈমর মনে হয়, তারা যেন একটা অভিজ্ঞতা দুজনে ভাগ করে নিচ্ছে। ফলে সে একটু হাসে, এমন ভাগাভাগির সময় যে-হাসি হাসা যায়, স্মৃতিতে নম্র অথচ গভীর।

'তোমার সম্বন্ধে কিন্তু দারুণ রিগার্ড।

'মানে?'

'সে ত প্রথম থেকেই এস-এম এস-এম করে যাচ্ছে। আমি প্রথমে বুঝতেই পারি নি, এস-এমটা আবার কে?'

'কী বলছ?'

'হ্যাঁ। তোমার লেখা থেকেই নাকি সব শিখেছে, তুমি নাকি ওদের থিয়োরেটিসিয়ান।'

'ধ্যুৎ।'

'কী ধ্যুৎ?'

'আমি ও সব লিখিই না।'

'অন্য কিছু ত লিখে থাকতে পার?'

'সে ত ইকনমিকসের, সে আর ও কী করে—'

'তুমি ত ওর সঙ্গে আলাপ কর নি, কী করে জানলে যে ও ইকনমিকসের লেখা বুঝতে পারবে না?'

'তা হয়ত পারে। কিন্তু আমাকে অতটা খাটির করতে যাবে কেন, আমি এদের কাউকে চিনিও না। আমাকেও এরা কেউ চেনে না।'

'না-চিনলে আর তোমার বাড়িতে আশ্রয়ের জন্য লোক আসবে কেন?'

'সে ত আমার কাছেও রহস্য! পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন ঠেকছে।'

'মানে?'

'আমার কথা আর কী জিগগেস করেছে?'

'হৈমন্তী চুপ করে যায়। কী বলবে একবার মনে মনে ভেবে নেয়। কারণ তার বলা আর শৌরীন্দ্রের ভাবার ভেতর কোথাও একটা খুব বড় ফারাক আছে। সে আর শৌরীন্দ্র কোনো অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করছে না। ঘটনাটা ঘটেছে তার, হৈমন্তীর, আর অভিজ্ঞতাটা হচ্ছে যেন শৌরীন্দ্রের। হৈমন্তীর মুখ থেকে ঘটনাটি শুনেই শৌরীন্দ্রের মন থেকে সেই অভিজ্ঞতাটির তৈরি অর্থ বেরিয়ে আসবে; কথার জবাব দিতে গিয়ে হৈমন্তী নিজেকে একটু বোকা মনে হতে থাকে—যেন তাকে দিয়ে এমন কিছু বলানো হচ্ছে যা সেই তৈরি অর্থের সঙ্গে খাপে-খাপে মিলে যাবে।

'তোমার সম্পর্কে বিকাশ আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে নি।'

'বললে যে!'

'কী?'

'কী জিজ্ঞাসা করেছে।'

'তা ত বলে নি।'

'বাঃ, বললে না, আমার লেখাটেখার কথা।'

'হ্যাঁ। কিন্তু কোনো প্রশ্নের কথা ত বলি নি,।'

'বললে না, কী রিগার্ড।'

'সে ত বলেইছে।'

'তা থেকে ত আমার বিষয়ে দু-চারটি কথাও উঠতে পারে।'

'সে উঠেছে।'

'কি?'

'সে ত ছেলেমানুষি ব্যাপার, ওদের ধারণা তুমি দিনরাত লাইব্রেরি থেকে লাইব্রেরিতে ছুটোছুটি করছ।'

'কেন।'

'ওদের থিয়োরি করতে।'

'তুমি কী বললে?'

'বললাম যে, তুমি দুপুরে অফিসে থাক।'

'ও কি জানতে চেয়েছিল দুপুরে আমি কোথায় থাকি?'

হৈম আবার সাবধান হয়, 'বলছি ত, তোমার সম্পর্কে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করে নি।'

'তা হলে আমার কথা কী হয়েছে?'

'তোমাকে নিয়ে খুব উচ্ছ্বসিত। বলল, ওকে যেদিন খবর দেয়া হয়, তোমার বাড়িতে শেলটার নিতে হবে, ও নাকি উত্তেজনায় ঘুমুতে পারে নি।'

'আমার কাছে কারা আসে বা আমি কোথায় যাই, তেমন কিছু কি জিজ্ঞাসা করেছে?'

'বললাম যে, তোমাকে নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে নি।'

হৈম উঠে দাঁড়ায়। শৌরীন্দ্র যেন কিছু একটা বুঝতে চাইছে আর সেই বোঝার আভাসও পাচ্ছে। ঘটনার অর্থ পালটে যাচ্ছে। সেই অর্থটা যুক্তিতে যুক্তিতে এত ঠাসা যে সব কথাই তাতে ধরা পড়ে যাবে। অথচ, হয়ত, বা নিশ্চয়ই শৌরীন্দ্রের অর্থটাই ঠিক। সে ত হৈমর চাইতে কয়েক সহস্র গুণ ভাল বোঝে ভাল ভাবে। আপাতত সেই ভাল বোঝা আর ঠিক ভাবা থেকে হৈম যে একটু ত্রাণ চায়। হৈম কাজে যেতে ঘর থেকে বেরয়। দরজায় গিয়ে মনে পড়ে ঘুরে বলে, 'বলছিল, তোমার কাছে নিশ্চয়ই নেতারা আসেন সব থিয়োরি বলতে ব বুঝতে। তেমন একটা আলোচনাসভা শুনতে পেলে ও বর্তে যেত।'

'অ্যাঁ?' শৌরীন্দ্রের এই ধ্বনিটিকে পেছনে রেখে হৈম বেরিয়ে যায়।

খেতে বসে ঘোঁতন বায়না ধরে, সে আর বিকাশ এক চেয়ারে বসে খাবে। এক চেয়ারে কখনো দুজন বসে? বোকা কোথাকার!' হৈম বলে, 'তুই না বড় হয়ে গেছিস?'

'হ্যাঁ বড় হয়েছি ত। বলো ত মা, আমি আর মামা দুজনে কী?' বিকাশ হাসছিল। 'বলো না মা।'

'কী আর হবে, জাম্বুবান আর হনুমান।'

'না, না, সত্যি করে বলো। ওটা ত খেলার সময় হয়।'

'জানি না বাবা, এখন বসো।'

'কমরেড', বলেই ঘোঁতন মুখে হাত চাপা দিয়ে বাবার দিকে তাকায়, শৌরীন্দ্র না হেসে পারে না।

'আমরা ত কমরেড, তাই এক চেয়ারে বসব।'

'ও, আচ্ছা, কমরেড, এসো, চলে এসো আমরা একসঙ্গে খাই,' শোনামাত্র ঘোঁতন দৌড়ে বিকাশের চেয়ারে যায়। বিকাশ একটু ডান দিকে সরে গিয়ে ঘোঁতনকে জায়গা দেয়।

'এই বিকাশ, না, না, তোমার অসুবিধে হবে।'

হৈমর আপত্তিতে বিকাশ বাঁ হাতে ঘোঁতনকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, কমরেডদের কি কোনো অসুবিধে হয়, ঘোঁতন।'

'ঘোঁতন, আমার কাছে আয় না,' শৌরীন্দ্র ডাকে।

'না বাবা, তুমি ত বাবা, তুমি ত কমরেড না।' বিকাশ ঘোঁতনের কানে কানে কী বলে। 'আচ্ছা' বলে ঘোঁতন বাবাকে ডাকে, 'বাবা, তুমি আমাদের বড় কমরেড, আমরা ছোট কমরেড।'

'তোমরা তা হলে নিয়ে নাও, আমি ঘোঁতনের ভাতটা মেখে দি?' হৈম ঘোঁতনের ভাতে ঝোল ঢালে।

'মা আমি নিজে মেখে খাই?'

'না। এখন রাত্রিতে নিজে মেখে খেতে হবে না, দুপুরে খেও।'

শৌরীন্দ্র বিকাশকে বলে, 'গড়িয়াহাট কেমন লাগল ?'

বিকাশ ভাত মুখে তোলার আগে বলে, 'ভালই ত খেলাম দেখলাম ঘুরলাম।'

হৈম যোগ করে, 'বাঃ, আর পুলিশ দেখে পালানোটাই বললে না!'

শৌরীন্দ্র জিজ্ঞাসা করে, 'সে আবার কী ?'

বিকাশ বলে, 'না, না একটা খাবার দোকানে ঢোকা হচ্ছিল, এক ল মতো মোটা মতো লোক কয়েক বার তাকানোতে সন্দেহ হল।'

'তার পর।'

'না, কিছু না, আমরা ঢুকলাম, লাইনে দাঁড়ালাম, খেলাম।'

'ঐ লোকটিও খেল ?'

'আমাদের সামনেই ছিল'।

বিকাশের এইটুকু উত্তরে হৈম যোগ করে, 'আমরা ত ভেতরে ঢুকে খেলাম।'

'পরে বেরিয়ে এসে কি আর দেখলেন ?'

'না, আমরা হেঁটে, ঘুরে ট্যাক্সি ধরলাম।'

ছোট একটি প্রশ্ন করে শৌরীন্দ্র বেশ বিস্তারিত উত্তর শুনতে অভ্যস্ত বিকাশের জবাব হয়ে যাচ্ছে বেশ ছোট। শৌরীন্দ্রকে আবার তা হলে প্রশ্ন করতে হয়। কিন্তু ও-রকম পর পর প্রশ্ন করে যাওয়া শৌরীন্দ্রের স্বভাব নয়। সে আন্দাজের চেষ্টা করে, শৌরীন্দ্র কী জানতে চাইছে।

নিচু গলায় শৌরীন্দ্র বলে ওঠে, 'দক্ষিণ কলকাতা, মানে বালিগঞ্জ অঞ্চলটা তুলনায় একটু শান্তই আছে।'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে বিকাশ বলে ওঠে, 'হ্যাঁ পুলিশ ত বেললাইন পেরিয়ে অপারেশন শুরু করছে। এই বাছাইয়ের কারণটা কী ?'

একটু পরে শৌরীন্দ্র বলে, 'দক্ষিণ কলকাতায় ত ভারতের অন্য রাজ্যে বিশেষত তামিলনাড়ুর, লোক অনেক বেশি।' হৈম আন্দাজ পায় না কথা বিকাশের প্রশ্নের জবাব হল কি না।

'তোমরা আমার সঙ্গে কেউ কথা বলছ না কেন ?' ঘোঁতন জিজ্ঞাসা করে

হৈম খুব ধীরে বলে, 'ঘোঁতন, তোমাকে বলেছি না, বড়রা যখন কা বলবেন, তার ভেতর কথা বলো না। তোমাকে পরে গল্প বলব, নাও, আ

াইয়ে দিচ্ছি।' বিকাশ ঘোঁতনের পিঠে হাত দেয়। হৈম ঘোঁতনের মুখে একটা ঢলা ঢুকিয়ে দেয়।

'গেরিলা নীতির দিক থেকে সাউথ ক্যালকাটায় অসুবিধে। গলিঘুঁজি কম, এই এলাকায় অ্যাকশন বেশি হতে পারে না। নর্থে এসকেপ রুট অনেক বেশি, অনেক দিনের শহর ত, এদিকটা ত নতুন।'

বিকাশের এই কথার কোনো জবাব দেয় না শৌরীন্দ্র। সেই নীরবতার প্রথম কিছুক্ষণকে মনে হতে পারে তার ভাবনার সময়, তার পর বোঝা যায় সে কিছু বলবে না। হৈম জানে, অনেকক্ষণ চুপ থেকেও শৌরীন্দ্র এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে পারে। হৈম এটাও যেন জানে যে এখন শৌরীন্দ্র কিছু বলবে না।

বিকাশ যখন এ-বাড়িতে এসেছে, শৌরীন্দ্র ছিল না, যদি থাকত, তা হলে শৌরীন্দ্র আর বিকাশের ভেতরের আলাপ সম্বন্ধের ছাঁচেই এ-বাড়ির অন্য সকলের সঙ্গে তার চেনাজানাটা গড়ে উঠত। কিন্তু শৌরীন্দ্রের বাড়িতে শৌরীন্দ্র ছাড়াই হৈম আর ঘোঁতনের সঙ্গে এক সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে খানিকটা, বিকাশের। সেই ছাঁচে ত আর শৌরীন্দ্র নিজেকে ঢালতে পারে না, সম্পূর্ণ। কিন্তু তার হলে মামা, কমরেড, ডেকে যার গায়ে-গা-লাগিয়ে চেয়ারে বসে থাকে, আর তার যাকে নিয়ে বাইরে ঘুরে আসে—সম্ভাব্য বিপদের ভেতরে, তার সঙ্গে সারা দিনের শেষে এখন সম্পূর্ণ একটা নতুন সম্বন্ধই বা সে গড়ে তোলে কেমন করে শৌরীন্দ্রের সঙ্গে বিকাশের আলাপে এই উদ্বেগটা থেকেই যাচ্ছিল।

হৈম জানে, শৌরীন্দ্র একটা কিছু ভেবে নিয়েছে। স্বভাবে এত নমনীয় নয় শৌরীন্দ্র যে সে তার সেই ভেবে নেয়াটাকে বদলাতে পারে। ঠিক হোক আর বেঠিক হোক, শৌরীন্দ্রের এই ভেবে নেয়া আর শৌরীন্দ্রের সঙ্গে বিকাশের আলাপ ত্রিচয়টা পাশাপাশি চলতে পারে কিছুক্ষণ বা কিছুদিন।

কিন্তু এই খাওয়ার টেবিলে বিকাশেরও যেন বয়স বেড়ে যায়। যত গুছিয়ে যায় ভেবে-ভেবে আর থেকে-থেকে বিকাশ এখন কথা বলে যায়, হৈম আর ঘোঁতনের সঙ্গেও যদি তেমনি করত তা হলে দুপুর থেকে এই সময়ের ভেতর কি বিকাশ-হৈম-ঘোঁতনের যেন-একটা-দল তৈরি হয়ে যেতে পারত।

হৈম হঠাৎ নিজের দিকে তাকায়। কাল রাতে যে-ছেলেটি এই বাড়ির দরজায়

করাঘাত করতে-করতে বোমার ঘায়ে মারা যায় সে বিকাশ নয়, এই আবিষ্কারের প্রবল স্বস্তির আত্মভোলা টানে তারা সবাই-ই ভেসে গিয়েছে। এখন দিনের শেষে সে টান মন্থর। অথবা কাল কে এসেছিল, আর আজ কে এসেছে, এই বিষয়টি শৌরীন্দ্রের কাছে কোনো আবিষ্কারের বিষয়ই নয়।

হৈমর মাথাটা দুই হাতে সামনে টেনে ঘোঁতন তার কানে-কানে কিছু বলতে চায়। বিকাশ একটু সরে যায়। মুখের ভেতরে আর ঠোঁটের পাশে ভাত নিয়ে ঘোঁতন হৈমর মাথাটা আরও টানে তার কানটাকে নিজের মুখের কাছে আনতে 'ঘোঁতন, এই ঘোঁতন, ছেড়ে দে, আমার চুলে ভাত লাগবে, বল না শুনছি। ঘোঁতন মুখ খুলে হাসতে পারে না বলে ঠোঁটটা চিপে রাখে কিন্তু ভেতরে হাসির দমক এতটাই উঠেছে তার, ঠোঁটটা খুলে ভাত ছিটিয়ে যেতে পারে। হৈমর মাত্র একটা হাত খোলা আর ঘোঁতন তাকে দুই হাতে টানছে, তাও আবার চুল ধরে। হৈমর আর উপায় থাকে না ঘোঁতনের বুকের কাছে তার মাথাটা না-নিয়ে। 'ঘোঁতন, প্লিজ ছেড়ে দে, ছেড়ে দে ঘোঁতন', ঘোঁতনের কোলের ভেতর থেকে হৈমর এই কথাতে এতই মজা পায় ঘোঁতন যে সে আর হাসিটা চাপতে পারে না, তার ঠোঁটটা ফ্যাক করে খুলে যায়। কিন্তু মুখে ভাত ছিল না বলে দু-চারটি ছাড়া ভাত ছিটোয় না। হাসিতে ঘোঁতনের হাতের মুঠো আলগা হয়ে গেলে হৈম সরে আসে। তার পর উঠে ঘোঁতনকে কোলে তুলে নিতে নিতে বলে, 'তোমরা উঠো না, ঘোঁতনের মুখ ধুইয়ে আসছি, উঠো না কিন্তু।'

'বাংলাদেশের ব্যাপার নিয়ে এমন একটা আদর্শগত মতপার্থক্য, এই সময় আপনার একটা থিয়োরি আমরা খুব আশা, অবশ্য সে ত পার্টির ব্যাপার কে লিখবেন,' বিকাশ শৌরীন্দ্রের দিকে তাকিয়ে বলে। শৌরীন্দ্র বিকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, কোনো জবাব দেয় না। 'পিকিং রেডিওর লাইন পাওয়ার পর আমাদের দ্বিধা কেটে যাওয়ারই কিন্তু আবার একটা গ্রুপ, ডকুমেন্ট সার্কুলেট করেছে,' শৌরীন্দ্রের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে বিকাশ বলে, শৌরীন্দ্র চোখ সরায় না।

হৈম ঘোঁতনকে নিয়ে ফিরে আসে। যে-চেয়ারে হৈম বসেছিল, সেটা টেবিল থেকে একটু সরিয়ে এনে ঘোঁতনকে বসিয়ে ডিশগুলো তুলে নিয়ে যায়। ঘুরে এসে

কাচের ছোট-ছোট বাটিতে কাসটার্ড দেয় শৌরীন্দ্র আর বিকাশের সামনে।

ঘোঁতন চিৎকার করে, 'আমার ? আমার ?'

'ঘোঁতন, চেঁচাবে না, এই যে তোমার, আমি খাইয়ে দেব, হাঁ করো।'

মিষ্টির লোভেই হোক, অথবা নিজে-নিজে খাওয়ার উদ্যোগ তাতেই শেষ হয়ে গেছে বলেই হোক—ঘোঁতন হাঁ করে, হৈম তাকে খাইয়ে দেয়। শৌরীন্দ্র ডান হাতেই খাচ্ছিল, দুই আঙুলে ছোট চামচেটাকে আলগা ধরে, চেয়ারে হেলে। বিকাশ বাঁ হাতে, টেবিলের ওপর ঝুঁকে।

'বিকাশ, তোমাকে আর-একটু দেব, উঠো না।'

'তুমি ত নিলে না ?'

'নেব। ঘোঁতনকে খাইয়ে নি, তুমি নেবে একটু ?'

'দাও।'

'দাঁড়া ঘোঁতন,' হৈম উঠে ফ্রিজ থেকে গোটা পাত্রটাই বের করে আনে, 'জমে নি তেমন, না ?'

'কেন, ভালই ত হয়েছে।'

বিকাশের বাটিটায় আবার প্রায় আগের পরিমাণেই দেয় হৈম, শৌরীন্দ্রকে এক চামচ—'তোমাকে আর-বেশি মিষ্টি খেতে হবে না।'

'কেন,' বিকাশ জিজ্ঞাসা করে।

'মিষ্টি খেলে মোটা হয়ে যাব এই ভয়ে।'

'মিষ্টি খেলে মোটা হয় নাকি ?'

'বসে-বসে কাজ, পরিশ্রম কম।'

শৌরীন্দ্রের কথা শুনে বিকাশ একবার হৈমর দিকে, আর-একবার শৌরীন্দ্রের দিকে খানিক হতভম্ব তাকায়, 'তা হলে ত সবাইকে মিষ্টি খাওয়ালেই হয়।'

'সবাইকে মোটা করলে তোমার সুবিধেটা কী ?'

'বাঃ, আমাদের ত সবাই রোগা, মানে স্বাস্থ্য ভাল না, মানে খেতেই পায় না, সবার মোটা হওয়াই ত ভাল।'

'তা হলে তুমি আরেকটু মোটা হও,' হৈম বিকাশকে আর-এক চামচ দেয়।

'মা, আমি মোটা হব।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই মোটা হও, এক চামচ মোটা।'

এখন হলের আলোটা নেবানো।

বিকাশের ঘরে আর ভেতরের ঘরে আলো জ্বলছে। সেই আলো হলে আসে। আবছায়া হলঘরে রাস্তার ওপরের জানলাটার পর্দা সরিয়ে শৌরীন্দ্র সিগারেট খাচ্ছিল। ঘোঁতন ঘুমিয়ে। হৈমর চলাফেরায় বাঁ পায়ের মট মট চুপচাপ বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে, মৃদু। সিগারেটটা শেষ হয়ে আসছিল। অ্যাশ-ট্রের কাছে যাওয়ার আলস্যে সিগারেটটাকে আরও টানছিল, যেন টানতে-টানতে নিবে যাবে। শেষে হাত বাড়িয়ে, বাইরের দেয়ালে ঘসে নিবিয়ে ফেলে দেয়। শৌরীন্দ্র একটু দাঁড়িয়ে থাকে। তার পর জানলার কপাট বন্ধ করে। দরজার ওপরে-নীচে ছিটকিনিও লাগিয়ে দেয়, ল্যাচের ওপর। একটু আনমনা যেতে-যেতে বিকাশের ঘরের ঝকঝকে পর্দা সরিয়ে শৌরীন্দ্র ঢোকে।

একটু পরে বিকাশের ঘর থেকে বেরিয়ে শৌরীন্দ্র যখন নিজের ঘরে যায়, তার পাশ দিয়েই হৈম ঘর থেকে বেরয়। শৌরীন্দ্র নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার কাজকম্ম হল?'

'হ্যাঁ। কেন।'

'না এমনি।'

'যাও, আসছি,' দরজার বাইরে গিয়ে হৈম বলে, 'বিকাশের জলটা রেখে আসি।'

'বিকাশ', হৈম বাইরে থেকে ডাকে।

'হ্যাঁ, বলুন,' বিকাশের দাঁড়িয়ে ওঠার আভাস মেলে।

পর্দা তুলে হৈম ভেতরে ঢোকে। ডিভানটার সামনেই বিকাশ দাঁড়িয়ে। পাশে ছোট টেবিলে জলটা রেখে হৈম বলে, 'রাতে দরকার হলে ডেকো কিন্তু। তোমার ডান দিকে দরজা, মনে রেখো, অবিশ্যি ঘরে আলো আসে। অন্ধকারে হঠাৎ উঠে দেয়ালে ধাক্কা খেও না।'

বিকাশ দু হাত কচলে হে হে হে হে হাসে, একটু চাপা। হৈম সারাদিনের শেষে আবিষ্কার করে বিকাশের হাসিটার রকমফেরও আছে। সে হেসে ফেলে।

বিকাশ বলে, 'আপনি না, সত্যি, এমন, আমি কি ঘোঁতন নাকি যে ঘরের দরজা চিনব না, হে হে হে হে।'

'নাও আর হে-হে হে-হে করতে হবে না। কাল সকাল থেকে আরেক রকম হাসি প্র্যাকটিস করবে, আমি শিখিয়ে দেব।'

'আমি বলছিলাম কাল সকালে আমি চলেও যেতে পারি।'

'সে আবার কখন ঠিক হল?'

'খবর পেয়েছি।'

'কখন পেলে?'

'ঐ মানে খবর ঠিক এসে যায় ত বিপ্লবীদের।'

'কী, সত্যি কাল সকালে যেতে হবে?'

'হ্যাঁ, মানে সেটা ত আপনাকে আমি বলতে পারি না। মানে আমার ডেভেলপমেন্ট অর্ডার যা পাব সেটা ত আমাকে গোপন রাখতে হবে। মানে গোপন রাখাটাই ত নিয়ম।'

'আচ্ছা, সকাল হোক ত।'

'না, তা ত বটেই, সকাল ত হবে, আপনি কিছু মনে করবেন না, আপনি ত আমাদের কমরেড নন তাই।'

'তোমাদের কমরেড হতে চাইছে কে?'

'না। আপনি তখন রাগ করলেন না, সকালে?'

'কখন বলো ত, তুমি আসার পর থেকে ত রেগেই আছি।'

'না, সেই আসার পরই।'

'কেন।'

'ঐ আপনাকে দিদি বলি নি বলে।'

'হেম একগাল হেসে বলে, 'সে ত তুমি বলবেই না। তোমার এস-এম আছে, তোমার কমরেড আছে আর তোমার আমাকে ডাকার দরকার কী?'

'হ্যাঁ। জানেন,' বিকাশ ভুরু কুঁচকে ফেলে, তার চোখটাও গোল হয়ে যায়, ঠোঁটের দু পাশে শক্ত ভাঁজ পড়ে, 'মানে, আমি এই পয়েন্টটা পার্টিতে তুলব যে আপনাকে কী বলে ডাকব।'

'অ্যাঁ ?'

'হ্যাঁ, মানে, এখনকার কথা নয়। আমাদের মুক্ত এলাকা বাড়তে-বাড়তে ও চার দিক থেকে এই শহরগুলোকে ঘিরে ফেলবে, তখন ত আর রাজধানীর কোথাও যাবার মতো কোনো ফাঁক থাকবে না।' বিকাশ তার কথা থামিয়ে হে-হে করে সংক্ষিপ্ত না-হেসে পারে না—সেই অবরুদ্ধ রাজধানীর ছবিটা একবার ভেবে নিয়ে। 'আমাদের সেই মুক্ত এলাকায় ত এগুলো ঠিক করে ফেলতে হবে। সব নতুন ডাক হবে। আপনি আমার কমরেড নন, আপনি আমার দিদিও নন, কিন্তু আপনি ত আমার কিছু হবেন।'

'কেন? তোমার কিছু আমাকে হতেই হবে কেন, আমার বয়েই গেছে। উনি মিটিং করে ঠিক করবেন আমি ওঁর কিছু হব!'

'আ-হা-হা, আপনি এত সাবজেকটিভ না! আমার-আপনার কথাই বলছি কিন্তু সেটা ত শুধু আপনার-আমার না। শুধু আপনার-আমার হলে ত সেটা বুর্জুয়াদের মতো ব্যাপার, বাবা-মা-ছেলেমেয়ে-বন্ধু-ভাইবোন সবই ওদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কিন্তু সবাই সবার কিছু হবে ত, আমি সেটার কথাই বলছি, আমাদের মুক্ত এলাকায়। তখন ত ঠিক করতে হবে কে, কাকে, কী বলে ডাকবে। তখন আর আপনি রাগ করতে পারবেন না, আমি এমন ঠিক ডাক ডেকে দেব না হে হে হে হে।'

'আচ্ছা হে-হে, এবার শুয়ে-শুয়ে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে বক্তৃতা করো।'

'হে হে, আপনার খুব সুবিধে।'

'কেন বলো ত, কিসের সুবিধে।'

'মার্কসবাদ মাওবাদ পড়া নেই ত, সংগঠনেরও ঝামেলা নেই, তাই যখন-তখন যা-ইচ্ছে নাম ধরে ডাকতে পারেন।'

এবার হৈম অবলম্বনহীন হেসে ফেলে, তার সারা শরীর ঝর্ঝর করে ওঠে, ঠোঁটে আঁচলচাপা দিয়ে হৈম বলে, 'বিকাশ, তুমি না সত্যি অ্যাবসার্ড।'

'কেন? স্বতঃস্ফূর্ততা দিয়ে কোনোদিন বিপ্লব হয় না, সমস্ত কিছু সংগঠিত করতে হবে।'

'আচ্ছা, তুমি নিজে-নিজে সংগঠিত হতে থাকো, আমি চললাম,' বেরিয়ে প

তুলে হৈম হাসিমুখে বলে, 'ঘুমোও।'

বিকাশ হাঁ করে কিছু বলতে, হৈম পর্দাটা ফেলে না।

'আমরা দুই ভাই কিন্তু একটাই নাম। সেই তখন, সবটাই যখন মুক্ত এলাকা হয়ে যাবে, আপনি আমাদের এক নামেই ডাকবেন—বিজয়বসন্ত।'

মুহূর্তে হৈমর চোখের সামনে বিকাশের দুই পাশ শূন্য ঠেকে—সেখানে আরেকজন না-থাকলে নামটা সম্পূর্ণ হয় না। হৈমর হাত থেকে যখন পর্দা খসে যায় তখন দু-জনের নাম একা বহন করে ঘরের মাঝখানে বিকাশ হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। যে বিষণ্ণ হাসি নিয়ে হৈম বিকাশের ঘরের পর্দা ছাড়ে, সেই হাসি নিয়েই নিজের ঘরে ঢোকে। তার ঘরে পৌঁছুবার আগেই বিকাশের ঘরের আলো নিবে যায়।

শৌরীন্দ্র বিছানায় টান-টান শুয়ে, চোখের সামনে কোনো বই নেই, ঘুমন্ত বৌতনকে জড়িয়েও নেই। উঁচু বালিশের ওপর দুই হাত জড়ো করে তাতে মাথা রেখে টানটান শোয়াটাকেও যেন আধশোয়া করে রাখা। হৈমর হাসির দিকে তাকিয়েই জিজ্ঞাসা করে, 'কী ব্যাপার?'

হৈম চিরুনিটা হাতে নিয়ে টুলটা শৌরীন্দ্রের পাশে টেনে এনে বসে। চুলটা খুলে দিয়ে বাঁ কাঁধ দিয়ে সামনে টেনে আনে। আঁচলটা দিয়ে মুখ-গলা-ঘাড় একবার মোছে। তারপর চিরুনিটা চুলে লাগিয়ে বলে, 'বিকাশটা-না সত্যি অ্যাবসার্ড'।

'কী হল?'

'আচ্ছা ও ত খুব বোকার মতো কথা বলে না, জানে-শোনে ত'

'হুঁ'।

'আবার এমনভাবে বলে মনে হয় কিছু জানে না।'

'কেন, বললটা কী?'

চুলে চিরুনিটা টানতে ঘাড়টা ঘোরাতে হয় শৌরীন্দ্রেরই দিকে কিন্তু তাকে ছাড়িয়ে, 'বলবে আর কী? সব কথাই ত মৌলিক,' চিরুনি নামিয়ে হৈম শৌরীন্দ্রের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে, মৌলিক শব্দটি ব্যবহারের চমকেই হয়ত।

'বললটা কী?' শৌরীন্দ্র আবারও জিজ্ঞাসা করে।

একটু চুপ করে থাকে হৈম, যেন ভাবছে কথাটা কী ভাবে বলবে। শৌরীন্দ্রের

দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, 'ওর স্টাইল ছাড়া ত ওর কথা বলা যায় না।'

'আচ্ছা, স্টাইল বাদ দাও, কথাটা শুনি না,' শৌরীন্দ্রের কথায় একটু চাপা অধৈর্যের আঁচ মেলে।

'বলছে, আপনাকে কী বলে ডাকব পার্টিতে ডিসিশন করে—এই রকম কী সব,' হৈম আবার ঘাড় ঘোরায়, তার চিরুনির আঁচড়ে চুলটা গুছিয়ে ওঠে খোক ধরে।

'পার্টি আর বিপ্লব ছাড়া কথাই নেই, না?' শৌরীন্দ্রের জিজ্ঞাসায় হৈম একটা 'হ্যাঁ-আ' দেয় বটে কিন্তু বোঝে শৌরীন্দ্র অন্য কিছু ইঙ্গিত করছে। শৌরীন্দ্র ইঙ্গিতটা স্পষ্ট করে না, হৈমর কাছ থেকে যেন তাই ইঙ্গিতের অর্থ পিছলে-পিছলে যায়।

ঘাড়টাতে একটা ঝাঁকি দিয়ে হৈমকে চুলের গোছাটাকে পিঠের ওপর ফেলতে হয়। তার পর দাঁড়িয়ে উঠে পেছন দিকে চিরুনি চালানোর জন্য ধনুকের মতো বেঁকে যেতে হয়। সেই উলটো বাঁক হৈমর সারা শরীরে যেমন এক বিপরীত প্রবাহ আনে, তেমনি তার মুখের রেখায় একটা টান ধরে, তাতে মুখের রেখায় বিকার আসে। মুখ পেছিয়ে নেয়া ত মানুষের স্বভাব নয়, মানুষের মুখ ত ঝুঁকেই আসতে চায়—এক আতঙ্ক ছাড়া।

'জানো, এই ছেলেটি আসবে বলে যে আমাকে খবর দিয়েছিল, তাকে ত আমি চিনি না,' শৌরীন্দ্র সোজা উঠে বসে হৈমকে বলে।

হৈম চিরুনি-চালানো থামিয়ে দেয়। 'হ্যাঁ।'

'এ-ছেলেটিকেও চেনার কোনো প্রশ্ন ওঠে না।'

হৈম এবার কোনো কথা বলে না। শৌরীন্দ্রও আর কিছু বলে না।

চিরুনিটা পেছন থেকে খুলে এনে তা থেকে আলাদা চুল খুলে নিতে নিতে হৈম অপেক্ষা করে শৌরীন্দ্র কিছু বলবে। কিন্তু শৌরীন্দ্র কিছু বলে না দেখে ও চুলগুলো খুলে, গুছিয়ে, চিরুনির মোটা ফাঁকের ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। 'তাতে কী হল?'

'ঘুমিয়ে পড়েছে?' শৌরীন্দ্র জিজ্ঞাসা করে।

'আলো ত নিবিয়ে দিল,' হৈম বাইরে তাকিয়ে বলে।

চিরুনিটা রেখে একটা মোটা কালো ফিতে দিয়ে হৈম চুলের গোড়ায় শক্ত করে গিঁট দেয়, তার দাঁতে সেই ফিতের একটা দিক ধরা থাকে। চোখ দিয়ে বেশি অনুসরণ করতে না পেরে, ঘুরে দেখতে হয়, শৌরীন্দ্র দরজাটা বন্ধ করছে। দাঁত থেকে ফিতেটা খুলে, বলে, 'কী ব্যাপার?' শৌরীন্দ্র এবার খাটে পা ঝুলিয়ে বসে।

খুব আস্তে শৌরীন্দ্র বলে ফেলে, 'আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে।'

শৌরীন্দ্র হৈমর দিকে চোখ তোলে নি, দেয়াল থেকে মেঝেতে চোখ নামিয়ে আনতে থাকে। ঠিক এই রকম কোনো কথা শৌরীন্দ্রকে কোনোদিন হৈমর কাছে বলতে হয় নি। তার গলার স্বরে কোথাও আত্মবিশ্বাসের সম্পূর্ণ অভাব ছিল, সম্পূর্ণ অভাব। তার স্বল্প কথাও গলার যে-জোয়ারিতে বাঁধা থাকে, সে-জোয়ারি কোথায়, শৌরীন্দ্রের গলা ফাঁকা-ফাঁকা শোনায়। তদুপরি, খুব চাপা গলায় বলার জন্য শৌরীন্দ্রের নিশ্বাস খরচ হয়ে যাচ্ছিল, যেন হাঁপায়।

হৈমকে টুলে বসে পড়তে হয়। গোড়ার শক্ত বাঁধনে টানটান কপাল ও টানটান চুলের শেষে তার সেই চুল পিঠময় ছড়িয়ে। কালো ফিতেটা চুলের গিঁঠ থেকে ঝুলছে। হৈম কোনো কথা বলতে পারে না।

'আমাকে খবর দিয়েছিল ঐ নামে একটি ছেলে কাল রাতে আসবে। কাল রাতে ত এসেও ছিল একজন।'

'সেটা ত অন্য কোনো ঘটনাও হতে পারে, একেবারে অন্য ঘটনাও ত হতে পারে।'

'তা হলে আমাদের দরজাতেই এসে ধাক্কা দেবে কেন?'

'বাঁচার জন্যে। দেখেছ, আলো জ্বলছিল।'

'আলো ত অন্য বাড়িতেও জ্বলছিল।'

'আমাদের বাড়িটা একটা মোড়ে, ঘুরেই পেয়ে যাচ্ছে।' নিচুতে হৈমর গলার স্বাভাবিকতাই স্পষ্ট হয়। গলাটাকে সে আরও নামায় না। কথার নিশ্চয়তা শুনে তাকে দ্বিধাহীন লাগে। সে যেন ভাবতে পেরেছে ঘটনার পরম্পরা।

একটু চুপ করে থেকে শৌরীন্দ্র বলে, 'কিন্তু, অতগুলো লোক মিলে একটা লোককে তাড়া করেছে, তার পর ঐ রকম বোমা মারল, অথচ কোনো মৃতদেহ

নেই, কেউ কিছু বললও না।'

'তুমিও ত বলো নি কাউকে কিছু।'

'ধরো, যদি লোকটা মারা গিয়ে থাকে, তা হলে শবটা ত ওরা নিয়ে গেছে, যারা মেরেছে।'

'হুঁ।' হত্যা-মৃত্যু-শব-লাশগুম এই প্রসঙ্গ মাত্র একটি রাত্রিতেই ওদের একান্ত নৈশ সংলাপের অবিচ্ছেদ্য হয়ে যায়। হত্যা ও তার প্রতিক্রিয়ার শৃঙ্খলে তাদের কোথায় স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে সেটাই তারা দু-জন মিলে যেন বের করে নিতে চায়।

'ধর পুলিশেরই সেই নকশালবিরোধী দল দিয়ে এই ছেলেটিকে মারা হল, কালকের এই ছেলেটিকে।'

'হুঁ।'

'তার পর তার কাছে যে-কাগজপত্র ছিল, তা থেকে পুলিশ জানল তার নাম কী, সে কী করত, কোথা থেকে আসছে, এবং আমার ঠিকানা বা হদিশ পেল।'

'হুঁ'।

'এখন, আমার বিষয়ে হয়ত পুলিশের একটা আন্দাজ আছে, আমার লেখা টেখা নিয়ে'।

'হুঁ'।

'তা হলে ঐ ছেলেটির কাছে, কালকের ঐ ছেলেটির কাছে, আমার খবর পেয়ে পুলিশ তা'তে পারে, তারা আমাকে যদি চোখে-চোখে রাখতে পারে তা হলে আরও অনেক কিছু জানতে পারবে।'

'হুঁ।'

'সেই জন্য কাউকে বিকাশ সাজিয়ে দুপুর বেলায় আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিল।' শৌরীন্দ্র হৈমর হুঁ শোনার অপেক্ষা করে, শুনতে না পেয়ে আবার বলে, 'সে এসে তোমাকে বলল সে কাল রাতে আসে নি,' শৌরীন্দ্র থামে, 'তাকে খুব আপ্যায়ন করে থাকতে দিলে,' শৌরীন্দ্রকে আবার থামতে হয়, তার কথার ওটাই ছন্দ, 'তার সঙ্গে আমার ছেলের খুব ভাব হয়ে গেল,...তোমার সঙ্গেও এক ধরনের সখ্যও ঘনিষ্ঠতা হল,...সে তার দরকারি খবরগুলো টুকরো-টুকরো জোগাড় করতে পারল।'

শৌরীন্দ্রের কথা থেমে যায় কি না বোঝা যায় না। যে-স্বরে কথা হচ্ছিল তাতে থেমে যাওয়া আর শুরু হওয়ার ভেতর খুব তফাত না-ও থাকতে পারে। হৈম কথাও বলছিল না, কিছু করছিলও না। টুলটার ওপর সে বসে ছিল, প্রায় যেন মূর্তি, অসমাপ্ত। তার চোখ খোলা ও মেলা ছিল কিন্তু সে কিছু দেখছিল না। তার মুখটাতে একটু পিচ্ছিলতা—যা ধোয়ামোছা হয় নি।

'গড়িয়াহাটে যাওয়ার ব্যাপারটাতেই আরও সন্দেহ হয়,' শুনে হৈম শৌরীন্দ্রের দিকে তাকায়, 'তার ওপর, পুলিশের কী ব্যাপার?'

'সে ত বিকাশ তোমাকে বলল. একটি লোককে দেখে কেমন সন্দেহ হয়েছিল ওর।'

'সন্দেহ মানে, ও-ই ত বলল, লোকটা পুলিশের লোক হতে পারে?' শৌরীন্দ্রের প্রশ্নের কোনো উত্তর হৈম দেয় না কিন্তু শৌরীন্দ্রের দিকে তাকিয়ে শোনে, 'তার পরও ত ও ঐ দোকানে ঢুকে সেই লোকটার পাশে দাঁড়াল?···এটা কি সম্ভব কখনো?···কিন্তু এ রকম একটি ঘটনায় তোমাকে খুব সহজেই ত বোঝানো যায় যে ও কী রকম বিপন্ন, মানে, পুলিশ কী রকম তাড়া করছে, মানে ওর খাঁটি চরিত্র, তা হলে ও যে-খবর চায়...'

শৌরীন্দ্রের কথা হৈম শুনছিল প্রায় পলক না ফেলে। বিকাশ এখানে আসার আগে কাল রাতের ঘটনাটিকে শৌরীন্দ্র যে-ভাবে সাজায়, খুব সহজেই যেন তা হৈমর বিশ্বাস্য ঠেকে। কিন্তু বিকাশের আচার আচরণ ও মেসাজ মতলবের ব্যাখ্যায় আসতেই, হৈমর চোখের সামনে, শৌরীন্দ্রের দিকে মেলে রাখা প্রায় পলকহীন চোখের সামনে, শৌরীন্দ্র আর হৈমর মাঝখানে বিকাশ এসে দাঁড়িয়ে হে-হে হে-হে হেসে যায়। শৌরীন্দ্রের কথাগুলি সেই স্বচ্ছ বিকাশের ভেতর দিয়ে হৈমর কাছে আসে।

শৌরীন্দ্র চুপ করে। সে চাপা স্বরেই কথা বলছিল—ঘরের ভেতর গোপন কথা যে-স্বরে বলা হয়। ফলে সে চুপ করলে মনে হয় না, ঘরটা নীরব হল। কথাটি যেন আবার শুরু হতে পারে, এক্ষুণি।

হৈম অস্থির উঠে দাঁড়ায়। গিঁট বাঁধা চুলগুলো দু-হাতে এলো খোঁপায় বেঁধে ফেলে। কালো দড়িটার দুটো দিক তার ঘাড়ের দু-পাশ দিয়ে গলার কাছে এসে

ঝোলে, দোলে। হৈম সেটা ছোঁয়ও না। কী কাজে হৈম দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসে। তার পর স্নানঘরে ঢুকে যায়। দরজা খোলা রেখেই ঢুকে হৈম মুখে চোখে ঘাড়ে গলায় ঝপঝপ জল ছেটাতে শুরু করে। যেন স্নান করলে তার তৃপ্তি হত, শরীর বা মন তার স্নান চায়। কিন্তু স্নানের আবার ঝামেলা বলে ঘাড়ে গলায় মুখে চোখে জল ছিটিয়ে অভ্যেস চালু রাখছে মাত্র। তোয়ালে মুখে চেপে হৈম বেরিয়ে আসে। জলের ছিটেয় তার কাঁধ-বুকের জামা-শাড়ি ভেজা।

এই রকম হাত-মুখ ধোয়ার পর পরিষ্কারের বদলে হৈমর যেন আরও একটু নোংরাই লাগে। সম্পূর্ণ স্নানের পরিচ্ছন্নতা ত দূরস্থান, বাইরে থেকে ঘুরে এসে চোখে-মুখে জল দেয়ার তৃপ্তিও হৈমর জুটেছে মনে হয় না। হৈম মুখ মোছে, ঘাড়মোছে, দেয়াল ধরে পা মোছে—তার পর শাড়ি বদলানো শুরু করে দেয় চটপট। যে-অভ্যাস অভ্যাসই শুধু, অভ্যাসেই যার শেষ, হৈম সেই অভ্যাসেই শরীরে কিছু পাউডার ঢেলে নেয়।

এই ঘরে তিন জন, সঠিক আড়াই জন, মানুষ থাকে। শোয়। জাগরণে ও ঘুমে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস বা স্বগতোক্তি বা সংলাপ বা ফ্যানের আওয়াজ বা কাচের দেয়ালে পোকা মাকড়ের প্রসিদ্ধ বিভ্রম এই ঘরের অংশ। এই ঘরের চার দেয়াল—ইট-সিমেন্ট বা কাচেরই হোক, সিলিং বা মেঝে, দরজা-জানলা জল-নিকাশী ফুটো এই ঘরের অংশ।

বিকাশ-সম্বন্ধে শৌরীন্দ্রের কথা, তখন এই অবকাশে, এই ঘরের অংশ হয়ে যাচ্ছিল। জল নাড়ালে যেমন জলের প্রতিবিম্ব মুছে যায়, হৈম তার ছোটাছুটিতে এই ঘরের বাতাসটাকে তেমনি নাড়িয়ে দিচ্ছিল।

কিন্তু শৌরীন্দ্রের জবাবে হৈমর ত কোনো কথা থাকে না। আর সে এমন দ্রুততায় তার দৈনন্দিন অভ্যাসে চলে যেতে পারে, যেন তাতেই শৌরীন্দ্রের কথাগুলো তারও কথা হয়ে ওঠে। বা কথাটি এমনি ব্যক্তিনিরপেক্ষ হয়ে ওঠে যেন সেই কথাটিই সত্য, বিশেষভাবে তারও নয়, শৌরীন্দ্রেরও নয়, শুধু সত্য।

'দেখো, খাওয়ার টেবিলেও এমন সব রাজনৈতিক কথা তুলছিল যাতে আমার রাজনৈতিক মতটা পরিষ্কার ধরা পড়ে—গেরিলা যুদ্ধ, বাংলাদেশ, পিকিং রেডিও···

শৌরীন্দ্র ওঠে। ঘরের ঐ ফালিটুকুতেই একবার পায়চারি করে। এ ঘরে

দরজা বন্ধ। কোনোদিন বন্ধ থাকে না। হল ঘরে গিয়ে লম্বা পায়চারি দু-একবার করে আসতে পারত শৌরীন্দ্র। কিন্তু সেখানেও বিকাশ!

হৈমকে একটু দাঁড়াতে হয়, শৌরীন্দ্র সরে না-দাঁড়ালে সে যেতে পারে না। এ-ঘর দুজনের শোয়ার ঘর, দু-জনের পায়চারির পক্ষে এ-ঘরটি বড় ছোট হয়ে যায়। অত কাছাকাছি মুখোমুখি হৈম বলে ফেলে, 'তোমার মত ত তুমি কাগজেই লেখ, সেটা নতুন করে জেনে আর কে তোমার কী করবে?'

'সে ত প্রবন্ধ, আলোচনা, তত্ত্বের, ইতিহাসের। এ যেন বলছে দলের প্রচারপত্র লেখার কথা, যেন আমি তাই লিখে থাকি।'

এই কথার জবাব দেবার দায় হৈমর নয়। সে শৌরীন্দ্রের সামনে থেকে পেছিয়ে আসে—বাইরে যাওয়ার দরজা পর্যন্ত তার মাত্র পা চার-পাঁচই পেছুবার জায়গা। 'তোমার মতো লোককে এ-রকম করে ভোলানো সম্ভব, কেউ ভাবে? তা হলে ভাবছ কেন, তুমি যা ভাবছ তা যদি হয়ও, তা হলেও ত ব্যাপারটি চুকেই যাবে। কেউ ত আর এখানে পাকাপাকি থাকতে পারে না।'

'সে রকমভাবে ত হয় না, পুলিশের হাতে হয়ত একটা প্রচার পত্র পড়েছে। কে লিখেছে খুঁজছে। আমাকে দিয়ে যদি একটা লিখিয়ে নিতে পারে তা হলে একটা সূত্র পেল।'

হৈম যতবারই তার নিজের মতো করে ব্যাপারটিকে সরল করে নিতে চায়, শৌরীন্দ্রের ব্যাখ্যায়, ততবারই সে নতুনতর প্যাঁচে পড়ে। শৌরীন্দ্রকে দিয়ে একটা কিছু লিখিয়ে নেবার জন্য তার এই বাড়ির ভেতরে একটা লোক পাশের ঘরে শুয়ে—এমন মায়াত্মক ষড়যন্ত্রের কথায় হৈমর চোখের সামনে দুর্নিবার দাঁড়ায় বিকাশ, বিকাশের সেই মুখ, সে জিজ্ঞেস করছিল এস-এমের কথা।

কিন্তু শৌরীন্দ্রের অভিজ্ঞতা ও ধ্যান-ধারণার কত দীর্ঘ দীর্ঘতার বিপরীতে হৈমর মাত্র একবেলার এক মুখের স্মৃতি। সে মুখ ত ঠুনকোই হওয়া উচিত যেন?

'তুমি যে কেন রাজি হলে, কাউকে বাড়িতে এমন রাখতে?'

'আমি কী করে না করব, কার কাছে না করব?'

'যিনি তোমাকে বলতে এসেছিলেন, তাঁকেই ত তুমি না করে দিতে পারতে।'

'সে ত জানেই না কিছু, তাকে শুধু খবরটা দিতে পাঠিয়েছে কেউ।'

'তা হলে ত যে-ই বাড়িতে থাকতে আসুক, তাকেই বলে দিতে পারতে তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

শৌরীন্দ্র থেমে যায়।

হৈমর গলা তার স্বাভাবিকতা সম্পূর্ণই হারাচ্ছিল। একটু উঁচুতে হৈমর যে অসংবদ্ধতা, তা নয়, হৈমর গলা থেকে স্বাভাবিকতাই নিঃসাড়ে লুপ্ত হচ্ছিল। কোনো ঝোড়ো বাতাসে যেন জানলার ভাঙা কাচ বালি এসে পড়ছিল—এমনই জলহীন, শুকনো বালুকাপাতের মতো শোনায় হৈমর চাপা গলা।

'কালকের ঘটনাটাই ত সব বদলে দিল। ঠিক ছেলেটিই হয়ত এসেছিল—' যে বিরতির পর শৌরীন্দ্র বলে, এই কথা আর হৈমর প্রশ্নর উত্তর হয় না।

সন্ধ্যা লাগতেই শৌরীন্দ্র বাড়ি ফেরে।

ঘোঁতন মিসমাদের বাড়ি। হৈম স্বরলিপির বই নিয়ে জানলার কাছে বসে ছিল, একটা গানের সুরের আভাস পেতে। গুনগুন করতে-করতে সুরটা যদি চেপে বসে তা হলে তুলতে চেষ্টা করবে, তা না হলে একটু গুনগুনিয়ে সুর খোঁজাতে মন ব্যস্ত থাকবে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে হৈম দেখেছিল, বিকাশ চলে গেছে। শৌরীন্দ্র হৈমর আগেই উঠেছিল। সে-ই বিকাশকে হয়ত চা-টা করে খাইয়েছে, দরজা খুলে দিয়েছে। আমাকে ডেকে দিলে না কেন, আর, চা-খাবার কিছু করে দিতে হত—এই কথাগুলি হৈমর মনে এসে গিয়েছিল ঘুম থেকে ওঠার পরের হঠাৎ বিস্মরণে। কিছুটা বিস্ময়েও। তার ঘুমটাই এত লম্বা হয়ে গেল, নাকি বিকাশের যাওয়াটাতেই এত তাড়াহুড়ো ছিল যে সে ঘুম থেকেই উঠতে পারল না বা ডাকাও গেল না তাকে। কিন্তু কথার আগেই কাল রাতের কথা তার মনে পড়ে গিয়েছিল। ঘোঁতন ঘুম থেকে উঠে অনেকক্ষণ কেঁদেছিল, তার নাকি মামার সঙ্গে যুদ্ধে যাবার কথা ছিল।

বিকাশ চলে যাওয়ার পর শৌরীন্দ্র যেন একটু বেশি গম্ভীর হয়ে যায় হৈমকে বলে না কখন, কেন গেল বিকাশ। যেন এই ভাবে বিকাশকে নিয়ে অনিশ্চয়তাটা দূর হতে পারে। শৌরীন্দ্র অফিস চলে গেলে, পর্দা-টর্দা খুলে ভাঁ

করে হৈম আবার তুলে রেখেছে।

প্রথমে কেমন একটা অস্বস্তি হয়েছিল হৈমর, পরে, মনে হয়, বিকাশের সঙ্গে সকালে তার দেখা না হয়ে ভালই হয়েছে। কাল রাতে শৌরীন্দ্রের কথা শোনার পর বিকাশের সঙ্গে হৈম ত আর আগের মতো কথা বলতে পারত না। শৌরীন্দ্রের কথা বিশ্বাস-অবিশ্বাস হৈমর ব্যাপারই নয়। কিন্তু শৌরীন্দ্রের ভাবনাচিন্তার সঙ্গে হৈম তার স্বভাবের কোনো বিরোধ বাধাতে চায় না। বিকাশ ত বোধ হয় জানতই, আজ সকালে হৈম ঘুম থেকে ওঠার আগেই সে চলে যাবে। একেবারে শেষ সময়টিতে, যার পরে আর বলার সুযোগ পেত না, নিজের নামটি বলে দিয়েছে, দুই ভাইয়ের এক নাম। বিকাশ—এই নামটা ভুলে যেতে পারত বৈ কি হৈম।

অফিস থেকে ফিরে শৌরীন্দ্র চায়ের সঙ্গে দুটো-একটা বিস্কুট মাত্র খায়। হাতমুখ ধুয়ে, জামা-কাপড় বদলে এসে, বসে, বলল, 'ঘোঁতন কোথায়!'

'মিসাম্মাদের বাড়ি গেছে। আসবে এখুনি।'

'ডাকো না একটু, বেটা খুব আড্ডাবাজ হয়েছে।'

'সারাদিন বক-বক-বক-বক ত চলছেই, চা দিয়ে ডেকে আনছি,' হৈমর গলায় সেই স্বাভাবিক স্থৈর্য ফিরে আসছে।

শৌরীন্দ্রকে চা-টা ধরিয়ে নিজের কাপটা রেখে হৈম ঘোঁতনকে আনতে বেরুচ্ছে, শৌরীন্দ্র বলে, 'খবরটা একটু ধরবে?' রেডিওটা খুলে হৈম বেরিয়ে যায়। দরজা খোলাই থাকে।

'বাবা, তুমি এসেছ, দাঁড়াও, আমি এসে গেছি,' রাস্তা থেকে ঘোঁতন চেঁচায়। তার পর গেটের কাছ থেকে খোলা দরজা দিয়ে ছুটে আসে। বাবা চা খাচ্ছে দেখে বলে ওঠে, 'আমাকে দাও।' শৌরীন্দ্র চায়ের কাপ ছেলের ঠোঁটে ধরে।

চেয়ারে বসে নিজের কাপটা হাতে নিতে-নিতে হৈম বলে, 'এঁটো কেন দাও?'

রেডিওতে খবর হয়। শৌরীন্দ্র জিজ্ঞাসা করে 'কেউ ত আসে নি আজকে?'

'না।'

'বাবা, তোমার সঙ্গে মামার দেখা হয়েছে? মামাকে নিয়ে এলে না কেন?'

হৈম আগ বাড়িয়ে বলে, 'মামা ত বাড়িতে গেছে। মামার মা কাঁদবে না?'

এই গল্পে সারাদিন ঘেঁাতনকে ভুলিয়েছে।

'আমি গেলে তুমি কাঁদবে, মা ?'

'সারাদিন এত কাঁদলাম যে,' হৈম একটু হাসি মেশায়।

'না, এখন আবার বলো, আমি চলে গেলে তুমি কাঁদবে।'

'তুমি না গেলেও কাঁদব,' হৈম চায়ের কাপটা রাখে।

'তা হলে কাঁদো, এখুনি কাঁদো।'

'আমি কাঁদলে তোর ভাল লাগে, ঘেঁাতন ?'

'ঘেঁাতন-ঘেঁাতন করে কাঁদো, আমার ভালো লাগে, কাঁদো না মা, কাঁদো।'

…সকাল প্রায় ছটায় দক্ষিণ কলকাতার যোধপুর পার্ক-আনোয়ার শাহ রোডের কাছে এক প্রহরারত পুলিশদলকে একদল উগ্রপন্থী আক্রমণ করলে পুলিশের সঙ্গে উগ্রপন্থীদের সংঘর্ষে বিজয়বসন্ত নামে এক উগ্রপন্থী নিহত।

'বিকাশ', নামটা হৈম স্পষ্ট বলতে পারে। তার পর একটা ঘরঘর আওয়াজ ওঠে—রেডিওর বা হৈমর গলার।

…একটি লুণ্ঠিত রাইফেল ও হাজা

শৌরীন্দ্র চাপা স্বরে বলে ওঠে, 'কী বলছ ? কে বলেছে ?'

হৈম শৌরীন্দ্রের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। বোধ হয় ওর আশা শৌরীন্দ্র বলবে, ওটাও বিকাশের নাম নয়। শৌরীন্দ্র অস্থির জানতে চায় 'কে বলেছে ?'

কোনো জবাব হৈম দিতে পারে না, চেয়ারে হেলান দেয়। মাত্র একদিন যে ছেলেটি তাদের বাড়িতে ছিল, পরেও আর-কোনোদিন দেখা হওয়ার কথা নয়, তার মারা যাওয়ার এমন খবর পেলে হৈমকে কী করতে হবে, তা হৈমর জানা নেই।

রেডিওর, না হৈমর গলার, কী-রকম ঘরঘর আওয়াজ বেরয়, চেনা যায় না।

ঘেঁাতন দৌড়ে ওর বাবাকে জড়িয়ে ধরে, 'বাবা, মা ও-রকম করছে কেন, বাবা !'

হৈম নড়ে বসে। শৌরীন্দ্র তখন চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছে, 'কী বলেছে ও ওর নাম ?'

'যে-নাম বলল রেডিওতে,' হৈমর স্বরে কোনো উত্তেজনা ছিল না, ঘুমের

ভেতরে কথা বললে যেমন থাকে না।

শৌরীন্দ্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ঘেঁাতনকেও দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। সে বাবার হাঁটু জড়িয়ে ধরে। 'ও কি তোমাকে ওর নাম-ঠিকানা বলেছিল?' হৈম কোনো উত্তর দেয় না। শৌরীন্দ্র একটু অপেক্ষা করে বলে, 'উত্তর দিচ্ছ না কেন, কখন বলেছিল?'

হৈম ওর আঁচলটা খুঁজছিল। পিঠের তলা থেকে বের করে সে তার ঠোঁটে চাপা দেয়, যেন ঠোঁটটাতে কোনো ব্যাথা।

শৌরীন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করে, 'কখন বলেছিল?'

'কাল রাতে।'

'তুমি ঘরে আসার আগে না পরে?'

'পরে ত আর ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।'

শৌরীন্দ্র পেছিয়ে যেতে চায়, না, বলতে চায়—তার আচমকা চলনে ঘেঁাতন পড়ে যায়। কেঁদে ওঠে।

হাত বাড়িয়ে হৈম ঘেঁাতনকে টেনে তুলে আনে। কোলে মুখ গোঁজার আগে ঘেঁাতন একবার চোরা চাউনিতে ওর মার দিকে চায়।

'তুমি কথাটা তখন আমাকে বললে না কেন?'

'তুমি ত বলেছিলে বিকাশ পুলিশের লোক,' হৈমর গলা বদলে গেছে, এটা ওর নিজের স্বর নয়।

'তুমি বললে না কেন ওর নাম-ঠিকানা জানো। আমি ত ওর কিছুই জানি না।'

শৌরীন্দ্রকে নয়, হৈম যেন খানিকটা নিজের মনেই বলে, 'শুধু নামে আর কী হত।'

কোলে ঘেঁাতন মাথা গুঁজে বলেই হয়ত হৈম এত নিচুতে তার স্বরের কাছাকাছি আসে যেন।

'মা, পুলিশকে মামা মেরে দেবে,' মুখটা সামান্য একটু তুলে ঘেঁাতন খুব নিচু গলায় হৈমকে বলে, যেন গোপনে। বলে তার বাবার দিকে তাকায় চোরা-চাউনিতে।

ছেলের মাথা হৈম কোলের ভেতর টেনে নেয়। দৈবের বা ইতিহাসের ছেনতাই থেকে বাঁচতে-বাঁচাতে মেয়েরা কোলটাকেই গুটোতে পারে, তাদের শরীরের সবচেয়ে ফাঁকা-ফাঁপা এই কোলটাকে।

'যদি জানতাম ওর নাম-ঠিকানা তোমার জানা'—শৌরীন্দ্রের বাক্যটি শেষ হয় না। সেই অসম্পূর্ণতা দীর্ঘতর হয়ে-হয়ে হৈমর নিজের নীরবতার সঙ্গে মেশে।

তাতে সময় কাটে। রেডিওর সংবাদের প্রতিধ্বনিও মিশে যেতে পারে। আরো অনেক সংবাদ ও মন্তব্য ও আলোচনা রেডিওতে হয়ে যায়। এক সময় ঘোঁতন হৈমর কোল থেকে মাথা তুলে দুই হাঁটুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতিতে তার প্রবেশের সময় হয়েছে কিনা যেন যাচাই করে। তাকে ঘিরে হৈমর দুই হাতের বেড় অটুট থাকে।

এক সময় হৈম ওঠে। ঘোঁতনকে মাথা ছুঁয়ে সঙ্গে নিয়ে শোয়ার ঘরের দিকে যায়। বিকাশের দরজাটার কাছাকাছি গিয়ে ঘোঁতন একবার ঘাড় ঘোরায় বাবার দিকে। কিন্তু হৈমর ডান দিকে থাকায় বেশি ঘোরাতে পারে না। শিথিল পা ফেলে এই দূরত্বটুকু হৈম খাড়া যায়। তার পেশাক-আসাকে গোছালো টান আর লম্বা মোটা বেণীটা মৃদু দোলে। কোথাও কোনো শোক থাকে না। কোথাও কোনো শোক থাকে না। বিকাশ ত এদের স্বজন ছিল না, বন্ধু ছিল না, গ্রামবাসী ছিল না। কয়েক ঘণ্টার জন্য বাড়িতে আশ্রয়প্রার্থী এক অজ্ঞাতনামা যুবকের জন্য শোকের কোনো সামাজিকতা নির্দিষ্ট নেই।

স্নানঘরের দরজায় ঘোঁতনকে দাঁড় করিয়ে হৈম সারা মুখে, গলায়, ঘাড়ে জলের ঝাপটা দেয়। আঁচলে মুখ চেপে বেরিয়ে আসে। ঘোঁতন বলে, 'মা মুখটা মোছো, তোয়ালে দিই?'

ঘোঁতনের মাথা ছুঁয়ে হৈম ঘর থেকে বাইরে আসে। শৌরীন্দ্র তখন খাবার টেবিলের চেয়ারে। রেডিওতে পল্লীগীতি বন্ধ করে, ঘুরে দাঁড়িয়ে, টেবিলের বিপরীতে শৌরীন্দ্রকে হৈম জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কাল রাতেই বলেছিলে, বিকাশকে চলে যেতে!' হৈমর গলার স্বর তখন দ্বিধাহীন হৈমরই। হৈমর গলায় প্রশ্ন না বিবরণ বোঝা যায় না। শৌরীন্দ্র এ কথার কোনো জবাব দেয় না। তাকায় না হৈমর দিকে।

যেমন বসে ছিল, তেমনি, শৌরীন্দ্র যেন আপনমনে বলে, 'সমস্তটাই ত পুলিশের ষড়যন্ত্র হতে পারে।'

ঘোঁতন সরে সেই চেয়ারটাতে বসে, একা। এখন ওরা তিনজনই খাওয়ার টেবিলটা ঘিরে।

'পুলিশ নকশালবিরোধী দল তৈরি করেছে, তারই কোনো ছেলে, খবর-জোগাড়ের কাজে লাগিয়েছিল, খবর যেটুকু পাওয়ার পেয়ে গেছে, তার পর শেষ করে দিয়েছে।' সবচেয়ে ভাল সাজিয়ে শৌরীন্দ্র আন্দাজটাকে যাচাই করতে চায় যেন!

'বিকাশ তা হলে কিছুতেই তোমাদের দলের হতে পারে না?'

'আমার দল কী?'

'তোমার তত্ত্বের—'

'সত্যি যদি তা হয়…'

'তা হলে?'

'আরো বিপদ হবে। তার ভাববে যে আমাদের কাছ থেকেই ছেলেটা ধরা পড়েছে, আমাদের কাছ থেকেই পুলিশ তার সব ঠিকানা জানতে পেরেছে। তখন…'

একটু চুপ করে থাকে হৈম। তার পর বলে, 'তুমি ভয় পাচ্ছ?'

আরও কিছু সময় কাটে। চেয়ার থেকে উঠে এসে ঘোঁতন মায়ের কোলে মুখ গোঁজে। ঘুম পেয়েছে। শৌরীন্দ্র জিজ্ঞাসা করে, 'কী নাম বলেছিল, বিকাশ?'

'রেডিওতে যা বলল। ওরা দুই ভাই, নাম একটাই।'

'এক নামে দুজন? তাও আবার হয় নাকি?' শৌরীন্দ্র যেন কোথায় যুক্তি পায়, তা হলে ত পুলিশের হাতে বিকাশ না হয়ে ওর সেই ভাইও ধরা পড়ে থাকতে পারে, বা মারা গিয়ে থাকতে পারে।'

'তুমি যুক্তি খুঁজছ?'

আড়াইটি প্রাণীর শ্বাস-প্রশ্বাস, চারটি দেয়াল, মেঝে, সিলিং, জলনিকাশী

ফুটো দরজা-জানালা—এই নিয়েই ত এই ঘর। জাগরণে, তন্দ্রায়, ঘুমে, ঘুম থেকে সহসা জাগরণে, চমকে, একটি নেহাত-বাচ্চা নিয়ে এরা সারা রাত ছটফটায় পরিত্রাণের জান্তব ইচ্ছায়। ভীরুতা, অপরাধ, আস্থা, অভিজ্ঞতা, ধারণার সেই জটিল জালে তারা দুজন জড়িয়ে পড়ছিল।

আর, যেমন হয়, পাশাপাশি ঘুমোলে যেমন হতেই পারে—দুজন দুজনের কাছ থেকে ত্রাণ চাইছিল, আবার, দুজন দুজনকে জড়িয়েও ধরছিল।

পাশাপাশি ঘুমোলে, এখন, এ-রকম হতেই পারে।